শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম খণ্ড

(শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে সম্পাদিত)

শ্রীঅনিলবরণ রায়

গীতা প্রচার কার্য্যালয়
১০৮।১১, মনোহরপুকুর রোড
পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীবিভূতিভূষণ রায়
১০৮।১১, মনোহরপুকুর রোড,
পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

১লা আশ্বিন, ১৩২৭
মূল্য বার আনা

মুদ্রাকর—
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় বি, এ,
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

অন্বয়। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ সমবেতাঃ মামকাঃ পাণ্ডবাঃ চ এব কিম্ অকুর্ব্বত?

অনুবাদ। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, সঞ্জয়, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া আমার পক্ষ ও পাণ্ডব পক্ষ কি করিলেন?

ব্যাখ্যা

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন হইতেই গীতা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র গীতার মধ্যে আর কোথাও ধৃতরাষ্ট্রের কোন কথা নাই। ধৃতরাষ্ট্র নিজ সারথি সঞ্জয়কে কুরুক্ষেত্রের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহাই গীতার ভূমিকা। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তত্ত্বকথার আলোচনা ভারতের প্রাচীন পদ্ধতি;

গীতার শিক্ষাও কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই শিক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের কথোপকথনের অবতারণা করা হইল কেন? গীতা-শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে এই ভূমিকার সার্থকতা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। জগতের অন্যান্য সকল ধর্ম্ম গ্রন্থের সহিত গীতার একটি প্রভেদ এই যে, ইহা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে। ইহা একটি মহাজাতির ইতিহাসের, মহাভারতের, অংশস্বরূপ। এই জাতি যখন তাহার জীবন-মরণের এক মহাসন্ধিক্ষণে উপস্থিত, সেই সন্ধিক্ষণকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতার ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং ইহাই পাঠকের মনে সর্ব্ব প্রথম স্পষ্ট করিয়া ধরিবার নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রসম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন লইয়াই গীতার আরম্ভ। যেমন জাতির জীবনে, তেমনই ব্যক্তির জীবনে এরূপ মহাসন্ধিক্ষণ আসিয়া থাকে—এবং সেই সব সন্ধিক্ষণে জাতি বা ব্যক্তি কিরূপে পরিচালিত হইবে সে সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়াই গীতার উদ্দেশ্য। এইরূপ জীবন-সমস্যার সমাধান যেরূপ গীতায় করা হইয়াছে, অদ্যাপি জগতে তাহার সমতুল্য উচ্চ সমাধান আর কোথাও দেখা যায় নাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় গীতাও একখানি স্বতন্ত্র ধর্ম্মগ্রন্থ; গ্রন্থখানির যাহাতে বহুল প্রচার হয় সেইজন্য গ্রন্থকার ইহাকে মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন; গীতা মহাভারতের অংশ নহে।

মহাভারত রচিত হইবার বহু পরে গীতা উহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ মত সমর্থন করিবার জন্য যে-সকল প্রমাণ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে তাহা মোটেই যথেষ্ট নহে বরং এরূপ মতের বিরুদ্ধ-প্রমাণই প্রবল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে, গীতা পরে রচিত হইয়া মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তথাপি গ্রন্থকার কিরূপ কৌশলের সহিত ইহাকে মহাভারতের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছেন তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের উল্লেখ কেবল গীতার প্রথমেই অথবা শেষেই করা হয় নাই কিন্তু গীতার নানা স্থানে গভীর আধ্যাত্মিক আলোচনার মধ্যেই পুনঃ পুনঃ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিবার কথা বলা হইয়াছে। অতএব, গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হউক আর না হউক, এক মহা-যুদ্ধরূপ সন্ধিক্ষণকে অবলম্বন করিয়া যে গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। সাধারণ ভাবে দার্শনিক তত্ত্ব ও মতবাদের আলোচনা করিবার নিমিত্ত গীতা লিখিত হয় নাই, জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে জাতিকে ও ব্যক্তিকে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় তাহাদের সর্ব্বোত্তম সমাধান করিয়া বাস্তবজীবনে মানুষকে সাহায্য করিবার জন্যই গীতার শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে।

ধর্ম্মক্ষেত্রে। কুরুক্ষেত্রের বিশেষণ ধর্ম্মক্ষেত্র। প্রাচীন ভারতে কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। কুরুক্ষেত্রে তপস্যা করিলে তাহা সহজে সিদ্ধি আনয়ন

করে, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গলাভ হয়, এই ধারণা সুপ্রচলিত ছিল। অতএব কুরুক্ষেত্রের বিশেষণ ধর্ম্মক্ষেত্র খুবই উপযোগী হইয়াছে। আমরা এখনই দেখিব যে, একভাবে সমস্ত সংসারকেই কুরুক্ষেত্র বলা যাইতে পারে ; সে ভাবে দেখিলেও সংসাররূপ কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র, কারণ, এই দুঃখদ্বন্দ্বময় সংসারই ধর্ম্মসাধনার প্রকৃষ্ট স্থান—এই সংসারে আমাদের কর্ত্তব্য প্রভৃতি ধর্ম্ম পালন করিয়াই আমরা দিব্যগতি, পুরুষার্থ লাভ করিতে পারি।

কুরুক্ষেত্রে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতার শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে ; গীতার মূল কথাগুলি বুঝিতে হইলে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের মর্ম্ম ও সার্থকতা কি এবং অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রে আসিয়া কি মহান্ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বাস্তবিক কোন সামান্য ও সাধারণ সমস্যার সমাধান করিতে জীবনের মূলতত্ত্বসমূহের গভীর আলোচনার কোন প্রয়োজনই হয় না। গীতার শিক্ষা যেরূপ মহান্, যেরূপ গভীর, যেরূপ ব্যাপক—গীতার গুরু, গীতার শিষ্য এবং গীতাশিক্ষার উপলক্ষ্য এই তিনটীই তাহার অনুরূপ। গীতার মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, এই তিনেরই মর্ম্ম বুঝা প্রয়োজন। গীতার গুরু স্বয়ং ভগবান ভূতলে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দূর করিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত জগদ্গুরুরূপে মানবশরীরে অবতীর্ণ ; গীতার শিষ্য সেই যুগের একজন প্রধান মনুষ্য, উচ্চ

আর্য্যচরিত্রের এক নিখুঁত নিদর্শন; আর গীতার উপলক্ষ্য —কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এই মহাসমরের তুলনা ভারতের ইতিহাসে, জগতের ইতিহাসে, আর কোথাও নাই। এই বিরাট ধ্বংসের লীলা যে বাস্তবিক পক্ষে কি ভীষণ, কুলের পক্ষে, জাতির পক্ষে, দেশের পক্ষে কি সর্ব্বনাশকর, কি ভয়াবহ, কি নৃশংস—কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুন যখন তাহা প্রথমে উপলব্ধি করিলেন, অর্জ্জুনের জগজ্জয়ী হস্তদ্বয় অবশ হইল, দেবদত্ত গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল, তাঁহার বীর ক্ষত্রিয়-হৃদয় শোকে, দুঃখে, ভয়ে অবসন্ন হইল। এরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড কি কখনও কাহারও কর্ত্তব্য হইতে পারে? ধর্ম্ম হইতে পারে? ইহাতে কি কখনও কাহারও কল্যাণ হইতে পারে? অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের চরম সমাধান করিতে যাইয়াই গীতা ঈশ্বর কি, জীব কি, জগৎ কি, জগতে জীবের ধর্ম্ম কি, কর্ত্তব্য কি, পুরুষার্থ কি—এই সকল প্রশ্ন তুলিয়াছে এবং যথাক্রমে উত্তর দিয়াছে।

অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রের যে ভীষণ রূপ দেখিয়া সংশয়ে ও ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা বিশ্বজগতেরই স্বরূপ। এই জগতে দিবারাত্র যে ভীষণ যুদ্ধ, ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড চলিতেছে তাহারই একটা দিক কুরুক্ষেত্রে একটু বিশেষ স্পষ্ট ভাবেই প্রকট হইয়াছিল। যতদিন আমরা বিশ্বের এই সংহার মূর্ত্তি স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিতেছি, ততদিন আমরা ভগবানকে কেবল আমাদের মনের মত কৃপা,

স্নেহ, কোমলতার আধার বলিয়া মনে করি এবং জীবনে এই আদর্শের অনুসরণ করাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া মানি। কিন্তু, সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে যখন আমাদের এই ধর্ম্ম বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে, যখন দেখি যে, সংসার আমাদের মনের মত ধর্ম্ম, ন্যায় ও করুণার মর্য্যাদা রক্ষা করে না, তখন আমরা সংশয়ে অভিভূত হই; কখনও ভাবি যে, এই জগত ভগবানের সৃষ্টি নয়, কোন সয়তানই বুঝি ইহার ভাগ্য-বিধাতা। আবার কখনও ভগবান অপেক্ষা প্রবল এক স্বতন্ত্র শক্তিরূপে সয়তানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রাণ চাহে না বলিয়া আমাদের ভিতরের বিশ্বাস ও ধারণা এবং বাস্তব জগতের নিষ্ঠুর সত্য এই দুইয়ের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ি। গীতা এই সমস্যা অতি স্পষ্ট ভাবে তুলিয়াছে,—যুদ্ধ ও ধ্বংস যে জগতের নীতি তাহা স্বীকার করিয়াছে, সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানকেই ধ্বংসকর্ত্তা বলিয়াছে এবং কেমন করিয়া এই ধ্বংস ও সৃষ্টির সমন্বয় হয়, কেমন করিয়া এই দ্বন্দ্বযুদ্ধময় সংসারে থাকিয়াই আধ্যাত্মিক জীবন বিকশিত করিয়া তোলা যায় গীতা তাহাই বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছে।

যুদ্ধ যে সৃষ্টির নীতি, ধ্বংস ছাড়া যে এক মূহূর্ত্ত এ জগৎ চলিতে পারে না, ভারতের উপনিষদে তাহা স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল। গ্রীস্‌দেশীয় প্রাচীন দার্শনিক হিরাক্লিটাস দেখিয়াছিলেন যে, War is the father of all

things, war is the king of all—যুদ্ধই সকল বস্তুর পিতা, যুদ্ধই সকলের রাজা। আধুনিক যুগে ডারুইন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই পুরাতন মতেরই কথঞ্চিৎ পুনরুদ্ধার করিয়া এবং অস্পষ্ট ভাবে বুঝিয়া Struggle for Existence, Survival of the fittest প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গীতা কুরুক্ষেত্রে জগতের এই অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য যুদ্ধনীতিকেই বাহ্যরূপে দেখাইয়াছে। ইহার যে ভিতরের দিক,—স্বয়ং ভগবানই যে এই যুদ্ধ ধ্বংসের ভিতর দিয়া জগৎকে ইহার লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতেছেন, জীবকে মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতের দিকে লইয়া যাইতেছেন, গীতা তাহা দেখাইয়াছে ভগবানের বিশ্বরূপের বর্ণনায়—কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃত্ত।

জগৎ-সংসারকে বুঝিতে হইলে তাহার শুধু একটি দিক দেখিলে চলিবে না, সকল দিকেই ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে হইবে। সংসারকে দেখা আর ভগবানকে দেখা একই কথা কারণ সংসার ভগবান ছাড়া নহে। ভগবানের শুধু শিবমূর্ত্তি দেখিলে চলিবে না, তাঁহার রুদ্রমুর্ত্তিও দেখিতে হইবে। এক ভগবানেরই মধ্যে এই আপাতবিরোধী দুই সত্তা—সৃষ্টি ও পালনের সত্তা, আবার ধ্বংসেরও সত্তা,—ইহা ভারত ব্যতীত অন্য কোথাও কোন ধর্ম্ম দেখিতে পারে নাই। ভগবানকে করাল ধ্বংসমূর্ত্তিতে দেখিবার সাহস এক হিন্দু-

ধর্ম্মেই আছে। বিশ্বশক্তিকে হিন্দু শুধু সর্ব্বমঙ্গলা দুর্গা বলে নাই; ভীষণা ধ্বংসনৃত্যপরায়ণা কালীমূর্ত্তিকে দেখাইয়া কেবল হিন্দুই বলিতে পারিয়াছে যে—"ইনিও মা, ইঁহাকেও ভগবান বলিয়াই জান, যদি সাহস থাকে, ভগবানের এই ভীষণ রূপেরও পূজা কর।" সত্যকে অকুণ্ঠিতভাবে দেখিবার এই সাহস হিন্দুর আছে, তাই হিন্দুধর্ম্ম আধ্যাত্মিকতায় এত উচ্চে উঠিতে পারিয়াছে।

আমরা বলিতেছি না যে, যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তি বড় নহে, হত্যা অপেক্ষা প্রেম বড় নহে; আমরা বলি না যে, পশুবলের বদলে আত্মিক শক্তির স্থাপন করিতে হইবে না, জগৎ হইতে যুদ্ধ উঠাইয়া দিয়া সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপনের ঐকান্তিক চেষ্টা করিতে হইবে না। অতীতে যুদ্ধের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা ছিল বলিয়া যে চিরকালই তাহা থাকিবে এমন কোন কথাই নাই। ভগবান কেবল মহাকাল নহেন, তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃদও বটেন; করালী কালীই আবার আনন্দময়ী মাতা। তিনি আমাদিগকে সমস্ত দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, ধ্বংসের ভিতর দিয়াই এক উচ্চ অবস্থার দিকে লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু এই উচ্চ অবস্থার স্বরূপ বুঝিতে হইলে, কেমন করিয়া সেই অবস্থায় উঠিতে পারা যায় তাহার সন্ধান পাইতে হইলে, বর্ত্তমানে জগতের গঠন কি, নিয়ম কি, স্বরূপ কি তাহা আমাদিগকে অকুণ্ঠিত ভাবে দেখিতেই হইবে, বুঝিতেই হইবে। কুরুক্ষেত্র আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতেই

হইবে—ধ্বংসলীলার সম্মুখে অর্জ্জুনের মত অত ভয় খাইলে চলিবে না।

যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, ধ্বংস এ-সব শুধু বাহ্যজগতের, জড়জগতের নীতি নহে—আমাদের মানসিক ও নৈতিক জগতেরও নীতি। আমাদের অন্তরের ভিতর অনবরত যে-সব দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছে তাহার ভিতর দিয়াই আমরা জ্ঞানে, চরিত্রে, আধ্যাত্মিকতায় গড়িয়া উঠিতেছি। অন্তর্জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বাসনা, অজ্ঞান, অহঙ্কার আমাদের শত্রু,—ইহাদিগকে বধ করিতে পারিলে তবেই আমরা অন্তর্জগতে জয়ী হইতে পারি। কুরুক্ষেত্রে আসিয়া অর্জ্জুনের অন্তর্জগতের যুদ্ধও তীব্রভাব ধারণ করে, তাহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই অন্তর্জগতের বিপ্লবে জয়লাভ কেমন করিয়া করা যায়, গীতায় অর্জ্জুনকে সেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাপ পুণ্যের দ্বন্দ্ব, ধর্ম্ম অধর্ম্মের যুদ্ধ কেবল অন্তর্জ্জগতেরই ব্যাপার নহে, বহির্জ্জগতেও এই সকল দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ চলিতেছে। মানব-সমাজে ধর্ম্মপক্ষ ও অধর্ম্মপক্ষে শারীরিক সংগ্রাম বাধিয়া থাকে এবং এই যুদ্ধে ধর্ম্মপক্ষকে সাহায্য করিয়া অধর্ম্মপক্ষকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত, অসাধুগণকে বিনাশ করিয়া জগতে ধর্ম্মসংরক্ষণের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান যুগে যুগে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্রে এইরূপই এক ধর্ম্মযুদ্ধের সূচনায় কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ ভগবান অর্জ্জুনের সহায় হইয়াছিলেন, ধর্ম্মপক্ষের ভরসাস্থল বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া জগতে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান

নিবারণ ও ধর্ম্মের সংস্থাপনরূপ কার্য্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। গীতার শিক্ষা বুঝিতে হইলে, অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের স্বরূপ স্মরণ রাখা আবশ্যক; গীতার প্রারম্ভে কুরুক্ষেত্রের বর্ণনায় এবং অর্জ্জুনের বিষাদের বর্ণনায় ইহাই সূচিত হইয়াছে।

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব। জগতে অনবরত যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধ চলিতেছে তাহাই মাঝে মাঝে বাহ্যজগতে মানুষে মানুষে জীবনমরণের সংগ্রামে পরিণত হয়। তখন যাঁহারা ধার্ম্মিক, যাঁহারা জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠা দেখিতে চান, তাঁহারা একপক্ষে দণ্ডায়মান হন এবং যাহারা অসুর-ভাবাপন্ন, অহঙ্কারপূর্ণ, যাহারা হিংসার বশে ন্যায়, সত্য, ধর্ম্মকে পদদলিত করিতে চায় তাহারা অপরপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। এই ধর্ম্মপক্ষ ও অধর্ম্মপক্ষের যুদ্ধই ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে দেবাসুর সংগ্রামের রূপকের ভিতর দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের যুদ্ধও এমনিই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধ,—এখানে একপক্ষে ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডবগণ, অপর পক্ষে অহমিকাপূর্ণ অসুরভাবাপন্ন ধৃতরাষ্ট্রসন্তানগণ। এরূপ যুদ্ধে ভগবান সকল সময়েই ধর্ম্মপক্ষের সহায় হন, কখনও তাঁহার বিভূতির দ্বারা অসুরগণকে দমন করেন, কখনও স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মপক্ষের সাহায্য করেন। যাঁহারা জ্ঞান দৃষ্টিতে দেখিতে পান যে ধর্ম্ম কোন্ পক্ষে, ভগবান কোন পক্ষের সহায় হইয়াছেন, যুদ্ধের চরম

ফলাফল সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সন্দেহই থাকে না। তাই সঞ্জয় গীতার শেষ শ্লোকে বলিয়াছেন—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থ ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ১৮।৭৮

কিমকুর্ব্বত। কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াই কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সন্ধি-স্থাপনের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্র, "কিমকুর্ব্বত?"—"তাহারা কি করিল?"—এ প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করিলেন? তাহারা যুদ্ধ করিতে গিয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু করিতে পারে এ সন্দেহ ধৃতরাষ্ট্রের মনে উঠিল কেন? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইলে যে ভীষণ নৃশংস ধ্বংসব্যাপার সাধিত হইবে, যে ভ্রাতৃবধ, জ্ঞাতিবধ, গুরুবধ হইয়া জাতিকুল উচ্ছন্ন যাইবার পথ পরিষ্কৃত হইবে—ধৃতরাষ্ট্র তাহাই কল্পনার চক্ষে দেখিতেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে যে এই সকল সম্ভব, সে সম্বন্ধে কমবেশী স্পষ্ট ধারণা সকলেরই ছিল। কিন্তু কোন ভীষণ ঘটনা দূর হইতে, পূর্ব্ব হইতে, মনের মধ্যে কল্পনা করা এক কথা এবং সমীপবর্ত্তী হইয়া সেই ঘটনার সম্মুখীন হওয়া আর এক কথা। কুরুক্ষেত্রের পরিণাম যাহারা ভাল করিয়া না বুঝিয়া এই ভীষণ যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রে সেই আসন্নধ্বংসের মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া তাহারা হয়ত নিজেদের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারে, যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে

পারে এবং ফলে কুরুক্ষেত্রের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত না হইয়া বিনাযুদ্ধেই একটা মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে—ধৃতরাষ্ট্রের মনে এইরূপ সন্দেহের উদয় হওয়াতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন - কিমকুর্ব্বত ? আমরা পরে দেখিব যে, ধৃতরাষ্ট্রের এই সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নহে। যুদ্ধ করিতে আগ্রহান্বিত অর্জ্জুন যখন সম্মুখে দেখিলেন যে, রাজ্য-সুখভোগের জন্য তাঁহার অতি আপন জন সকলকে বধ করিয়া যুদ্ধ জয় করিতে হইবে, তখন তিনি শোকে, দুঃখে, পাপভয়ে অবসন্ন হইয়া গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিলেন। সেই অবসাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা উপলক্ষ্যেই গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়। সঞ্জয় উবাচ, তদা তু রাজা দুর্য্যোধনঃ পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা আচার্য্যং উপসঙ্গম্য বচনম্ অব্রবীৎ।

অনুবাদ। সঞ্জয় বলিলেন, তখন রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যগণকে ব্যূহাকারে অবস্থিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা

রাজা দুর্য্যোধনঃ। যাঁহারা মহাভারতের সহিত কিছু-মাত্র পরিচিত তাঁহাদিগকে রাজা দুর্য্যোধনের চরিত্র সম্বন্ধে

কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। দুর্য্যোধন ক্রূর, স্বার্থপর, লোভী, পরস্বাপহারী, উগ্রস্বভাব, দম্ভমানমদান্বিত, এক কথায় আসুরিক ভাবের পূর্ণ মূর্ত্তি। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে আসুরিক চরিত্রের লোকগণের বর্ণনা আছে। তাহারা অহঙ্কার ও মোহে মত্ত হইয়া জগতের নানা অকল্যাণ সাধন করে, জগৎকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার জন্যই তাহাদের জন্ম—ক্ষয়ায়ঃ জগতোঽহিতাঃ। ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া জগৎকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করাইতে হইলে এই সব আসুরিক লোকের দমন একান্ত আবশ্যক এবং ইহার জন্য যুগে যুগে ধর্ম্মযুদ্ধের অবতারণা করিতে হয়। দুর্য্যোধন এই আসুরী সম্পদের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আসুরী সম্পদের বিপরীত হইতেছে দৈবী সম্পদ—দেবোচিত গুণ। মানুষের মধ্যে এই দুই ভাবেরই মিশ্রণ আছে—অসুরভাব ও দেবভাব। অসুরভাব হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়া কেমন করিয়া মানুষ দেবভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, দেবজীবন লাভ করিতে পারে গীতায় তাহারই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অর্জ্জুনের ন্যায় যে-সব স্বধর্ম্মপরায়ণ আস্তিক চরিত্রবান ব্যক্তির মধ্যে মনুষ্যত্বের সুচারু বিকাশ হইয়াছে, তাঁহারাই দিব্য জীবন লাভের আশা করিতে পারেন। অর্জ্জুনই গীতা-শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার চরিত্র তুলনার দ্বারা পরিস্ফুট করিবার জন্য গীতাকার প্রথমেই দুর্য্যোধনের চরিত্রের কিছু পরিচয় দিয়াছেন।

যুদ্ধে উদ্যত কুরুপাণ্ডব সৈন্য দেখিয়া অর্জ্জুনের হৃদয়ে আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহ, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, পাপের ভয়, কুলনাশ, জাতিনাশের ভয় প্রভৃতি উদয় হওয়ায় তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু লোভে হতবুদ্ধি, স্বার্থপর, নিষ্ঠুরস্বভাব দুর্য্যোধনের হৃদয় এই সকল কোমলভাবে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। দুর্য্যোধন ধীরভাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে উভয়পক্ষের বলাবল হিসাব করিতে লাগিলেন এবং গুরু দ্রোণাচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাবধানে যুদ্ধ করিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং। কৌরবগণ অপেক্ষা পাণ্ডবদের সৈন্য অনেক কম ছিল। যাহাতে সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই প্রবল কৌরবগণের সম্মুখীন হইতে পারা যায় সেইজন্য পাণ্ডবপক্ষীয় সেনানায়কগণ বজ্র নামক ব্যূহ রচনা করিয়া নিজসৈন্যগণের সমাবেশ করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টি দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের সেই ব্যূহ রচনা দেখিয়া সেইদিকে রণশাস্ত্রবিশারদ অস্ত্র-গুরু দ্রোণাচার্য্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য। রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিতে দুর্য্যোধন যে কিরূপ পরিপক্ক ছিলেন এখানে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাণ্ডববাহিনীকে ব্যূহাকারে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার সেনাপতি পিতামহ ভীষ্মের নিকট না গিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত

হইলেন। ভীষ্মের হৃদয়ে পাণ্ডবদের প্রতি খুবই স্নেহ ছিল; দুর্য্যোধনেরই পক্ষ যে অন্যায়ের, অধর্ম্মের পক্ষ তাহা স্পষ্ট বলিতে তিনি কোন দিনই কুণ্ঠিত হন নাই। যাহাতে কুরুপাণ্ডবের জাতিকুলক্ষয়কারী যুদ্ধ না বাধে সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। কিন্তু যখন কিছুতেই যুদ্ধ বন্ধ করিতে পারা গেল না এবং কুরুপাণ্ডবের গৃহবিরোধকে অবলম্বন করিয়া কুরুজাতির বহু শত্রু আসিয়া পাণ্ডবগণের পক্ষে যোগদান করিল তখন কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম জাতিকুল রক্ষার্থে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বাধ্যবাধকতার সূক্ষ্মবিচার করিয়া স্থির করিলেন যে, তিনি মাত্র দশদিন কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া নিরস্ত হইবেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাপ্রাণ ভীষ্মের মনের ভাব হীনমতি দুর্য্যোধন বুঝিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার মনে খুবই সংশয় হইয়াছিল যে, ভীষ্ম ভাল করিয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবেন না। অতএব, তিনি ভীষ্মের নিকট না গিয়া প্রথমেই আচার্য্য দ্রোণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে তাঁহার আরও একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। দ্রোণাচার্য্য কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রগুরু, অসামান্য যোদ্ধা, তাঁহাকে প্রথমে সেনাপতিত্বে বরণ না করিয়া ভীষ্মকে সেনাপতি করা হইল, ইহাতে দ্রোণের ঈর্ষ্যার উদয় হইতে পারে; তিনি ভাল করিয়া যুদ্ধ না করিতে পারেন—এরূপ আশঙ্কা দুর্য্যোধনের মনে উদয় হওয়ায় তিনি প্রথমেই দ্রোণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া

কথার ভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে যুদ্ধ জয়ের জন্য তিনি প্রধানতঃ দ্রোণাচার্য্যের উপরেই নির্ভর করেন।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

অন্বয়। আচার্য্য! তব ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ব্যূঢ়াং পাণ্ডুপুত্রাণাং এতাং মহতীং চমূং পশ্য।

অনুবাদ। দেখুন, আচার্য্য, আপনার মেধাবী শিষ্য দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদের এই বিরাট সৈন্য লইয়া কেমন ব্যূহ রচনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা

মহতীং চমূম্। দুর্য্যোধন যদিও জানিতেন যে, তাঁহার পক্ষেই সৈন্য ও শক্তির সমাবেশ সমধিক তথাপি শত্রুকে ছোট ভাবিবার মত বুদ্ধিহীন তিনি ছিলেন না। পাণ্ডবসৈন্য মহান, তাহার উপর মেধাবী ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক কৌশলের সহিত ব্যূহরচনা করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ—অতএব, শত্রু সামান্য নহে, অতি সাবধানের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই দুর্য্যোধন দ্রোণের নিকট ইঙ্গিত করিলেন।

দ্রুপদপুত্রেণ। পাণ্ডবগণ, বিশেষতঃ অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়শিষ্য; পাছে সেইজন্য যুদ্ধ করিতে দ্রোণের দ্বিধা হয়, তাই কৌশলে দুর্য্যোধন প্রথমেই দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের নাম

উল্লেখ করিলেন। দ্রোণ ব্যক্তিগতভাবে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের ঘোর শত্রু; পাঞ্চালদেশের রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন গুরু দ্রোণকে বধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাই দুর্য্যোধন ভাবিলেন এই ব্যক্তিগত বৈরভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে আচার্য্য শান্তির পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ উৎসাহে যুদ্ধ করিবেন।

তব শিষ্যেণ। ধৃষ্টদ্যুম্ন যতই মেধাবী বা কৌশলপরায়ণ হউক, গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকটেই তাঁহার শিক্ষা অতএব, ধৃষ্টদ্যুম্ন যে ব্যূহ রচনা করিয়াছেন, দ্রোণাচার্য্য তাহা সহজেই ভেদ করিতে পারিবেন, দুর্য্যোধন এখানে যেন তাহাই ইঙ্গিত করিলেন।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্ :
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥৬॥

অন্বয়। অত্র মহেষ্বাসাঃ যুধি ভীমার্জ্জুনসমা শূরাঃ মহারথঃ যুযুধানঃ বিরাটঃ চ দ্রুপদঃ, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, কাশিরাজঃ চ, নরপুঙ্গবঃ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ চ, শৈব্যঃ, বিক্রান্ত যুধামন্যুঃ চ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাশ্চ সৌভদ্রঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ, সর্ব্বে এব মহারথাঃ।

অনুবাদ। পাণ্ডবপক্ষে এমন সব মহাধনুর্দ্ধর বীর রহিয়াছেন, যাঁহারা যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনেরই সমান—যথা, মহারথী যুযুধান (সাত্যকি), বিরাট রাজা দ্রুপদ, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশিরাজ ; নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিত, কুন্তিভোজ ও শৈব্য, পরাক্রান্ত যুধামন্যু ও বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রার পুত্র (অভিমন্যু) এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র—ইহারা সকলেই মহারথী।

ব্যাখ্যা

অত্র শূরা। পাণ্ডবপক্ষের বিশিষ্ট বীর যাঁহারা, দুর্য্যোধন তাঁহাদের কয়জনার নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন ইঁহারা সকলেই মহারথী, ভীম ও অর্জ্জুনের ন্যায় যোদ্ধা। ইঁহাদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে ইহাই দুর্য্যোধনের বক্তব্য।

দুর্য্যোধন উভয়পক্ষের সৈন্যসমাবেশের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কুরুক্ষেত্রের ভীষণ মূর্ত্তিটি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতে ক্ষত্রিয়কুলে যেখানে যত প্রধান প্রধান নরপতি ও যোদ্ধা আছেন তাঁহারা হয় পাণ্ডবপক্ষে না হয় কৌরবপক্ষে আসিয়া যোগদান করিয়াছেন। কোন পক্ষই হীনবল নহে—অতএব শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইলে কুরুক্ষেত্রে যে ভারতের ক্ষাত্রশক্তি একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কুরুক্ষেত্রের এই দিকটা লোভান্ধ

দুর্য্যোধনের চক্ষুতে পড়ে নাই, কিন্তু ধর্ম্ম-প্রাণ অর্জ্জুন তাহা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন।

এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়া থাকেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ রূপক, এমন কি সমস্ত মহাভারতই রূপক; কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন বলিয়া কেহ ছিলেন না; কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে বাস্তবিক দুই মহাসৈন্যের যুদ্ধ হয় নাই। মানুষের অন্তরের মধ্যে অনবরত যে পুণ্যবৃত্তি ও পাপবৃত্তির সংগ্রাম চলিতেছে তাহাই রূপকছলে সমগ্র মহাভারতে, বিশেষতঃ গীতায় বর্ণিত হইয়াছে। কৌরবসেনা—পাপবুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ; পাণ্ডবসেনা—সনাতন ধর্ম্মপ্রবৃত্তিনিচয়। কৃষ্ণ—ভগবান্, অর্জ্জুন—জীব, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—সাধনসমর ইত্যাদি। কিন্তু মহাভারতের ভাষা ও রচনাপ্রণালী যেরূপ তাহা হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে গীতার সরল দর্শনোচিত ভাষাকে অদ্ভুত ভাবে টানিয়া ছিঁড়িয়া বিকৃত করিতে হয় এবং গীতার স্পষ্ট সহজ কথাগুলিকে অনাবশ্যক ভাবে রহস্যজালমণ্ডিত বলিয়া বুঝিতে হয়। বেদের ভাষা এবং পুরাণের অন্ততঃ পক্ষে কতক অংশের ভাষা যে নিছক রূপক তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। সেখানে বাহ্য দৃশ্য ও ঘটনার মধ্য দিয়া উপমা ও রূপকছলে অন্তর্জগতের নিগূঢ় সত্যসমূহ বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু গীতার ভাষা ও রচনাপ্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মানুষের

বাস্তব জীবনে যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যা উঠিয়া থাকে, গীতা সরল ভাষায় স্পষ্ট ভাবে সেই সবেরই সমাধান করিতে চাহিয়াছে। অতএব গীতার স্পষ্ট ভাব ও ভাষাকে খেয়াল মত বিকৃত করিলে চলিবে না।

মানুষের অন্তরের মধ্যে যে অনবরত পাপ ও পুণ্যের সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা খুবই সত্য। কিন্তু বহির্জগতেও এই সংগ্রাম চলিতেছে, কোন কোন মানুষ পাপের পক্ষ গ্রহণ করে, কোন কোন মানুষ পুণ্যের পক্ষ গ্রহণ করে এবং দুইপক্ষে শারীরিক সংগ্রাম বাস্তবিকই বাধে, মানব জাতির ইতিহাস তাহার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। এইরূপ এক বাস্তব মহাযুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া গীতার শিক্ষা রচিত—অতএব সেই মহাযুদ্ধকে রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিলে গীতার শিক্ষাকে বিকৃত ও খর্ব্ব করা হয়। সত্য বটে যে, মানুষের মধ্যেই ভগবান ও জীব দুইই রহিয়াছে, হৃদিস্থিত ভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারিলে জীব পাপবৃত্তি ও পুণ্যবৃত্তির সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া পরম শ্রেয়স্কর পথ দেখিতে পায়। কিন্তু যে ভগবান মানুষের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া ভিতর হইতে মানুষকে পরিচালনা করিতেছেন, তিনিই আবার মানবমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বহির্জগতে অবতীর্ণ হইতে পারেন এবং মানুষের মতই সখা, গুরু, নেতারূপে মানুষকে সাহায্য করিতে পারেন। গীতায় ভগবানের এইরূপ অবতার স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে—'সম্ভবামি যুগে যুগে।' শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ এক

অবতার, তিনি মানবরূপে বাহ্যজগতে অবতীর্ণ হইয়া অর্জ্জুনকে প্রধান যন্ত্র করিয়া এক বাহ্য যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন, ইহাই গীতা-শিক্ষার কাঠাম; অতএব শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে ভগবান ও জীবের রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিলে গীতার এক প্রধান শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। আর এরূপ ব্যাখ্যা করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাস্তবিক ঘটিয়াছিল, অর্জ্জুন বাস্তবিক মানুষ, শ্রীকৃষ্ণ মানবরূপী ভগবান, অবতার, ইহা স্বীকার করিয়া লইলে গীতা বুঝিতে কোথাও বাধে না, বরং গীতার সকল-স্থানের শিক্ষা অতি সহজ ও স্পষ্ট হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে এই সরল স্বাভাবিক ব্যাখ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া খেয়ালমত গীতার অর্থকে বিকৃত করিয়া সবটাকে রূপক বলিবার কি সার্থকতা আছে?

যুযুধানো বিরাটশ্চ। গীতাকে রূপক বলিয়া যাঁহারা ব্যাখ্যা করিতে চান তাঁহাদিগকে পদে পদে কিরূপ মুস্কিলে পড়িতে হয় এই কয় শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়। এখানে ভারতের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ক্ষত্রিয় বংশের ইতিহাসবিখ্যাত নৃপতিগণের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইঁহাদিগকে বাস্তবিক মানুষ বলিয়া ধরিলে গীতাকে রূপক বলা যায় না, তাই এই সকল নামের কিরূপ কল্পিত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, আমরা এখানে তাহার কিছু নমুনা দেখাইতেছি।

ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতেছেন চৈতন্যজ্যোতি। তিনি পাণ্ডবসৈন্যের

ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন অর্থাৎ সাধনকালে চৈতন্যজ্যোতিতে ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্ভাসিত হয়, সাধনানুকূল শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ষট্ সম্পত্তি এবং বিবেক ও বৈরাগ্য উত্তেজিত হয়। যুযুধান (সাত্যকি) হইতেছেন শ্রদ্ধা, বিরাট—সমাধি, দ্রুপদ—অন্তর্যামিত্ব, ধৃষ্টকেতু—যম, শৈব্য—নিয়ম, কাশিরাজ—প্রজ্ঞা, পুরুজিৎ—প্রত্যাহার, কুন্তিভোজ—আসন, যুধামন্যু—প্রাণায়াম, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র —পঞ্চরিপু ইত্যাদি। গীতার সহজ স্পষ্ট কথাগুলিকে এরূপ ভাবে কঠিন রহস্যময় করিয়া তুলিবার সার্থকতা কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বাস্তবিক মানুষে মানুষে শারীরিক যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করিয়াই গীতার শিক্ষা রচিত হইয়াছিল,—গীতা বুঝিতে হইলে ইহা সকল সময়েই আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা কিনা এবং উল্লিখিত বীরগণ সেই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে এখানে কোন আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে ঐতিহাসিক ঘটনা তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু যদিই ইহা কবির কল্পনা হয়, তাহা হইলেও গীতার রচয়িতা একটি বিরাট শারীরিক যুদ্ধ ও ধ্বংসকাণ্ডের কল্পিত ছবিকে অবলম্বন করিয়া, ভিত্তিভূমি করিয়া, গীতার শিক্ষা রচনা করিয়াছেন, তিনি রূপকের অন্তরালে কেবল অন্তর্জগতের যুদ্ধই বর্ণনা করেন নাই।

তবে গীতার বর্ণনা নিছক রূপক না হইলেও আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, গীতা যে অবস্থাকে উপলক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহা একটা সাধারণ ব্যাপার নহে, তাহা একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ আদর্শ অবস্থা। মানবজাতির এক ভীষণ ধ্বংসের ক্ষণ আসন্ন,—ইহাই কুরুক্ষেত্রের স্বরূপ। বাস্তবিক গীতার ন্যায় গভীর ব্যাপক শিক্ষার প্রচার করিতে হইলে এইরূপ আদর্শ সঙ্গীন অবস্থা আশ্রয় না করিলে চলে না। গীতা মানবজীবনের নিগূঢ় সমস্যাগুলি তুলিয়া তাহাদের চরম সমাধান করিতে চায়, কোন সামান্য সাধারণ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া সেই সব গভীর সমস্যার অবতারণা করা যায় না। মানবজাতিকে ধর্ম্মের পথে, দিব্যরাজ্যের পথে অগ্রসর করাইবার জন্য যুগে যুগে মানবসমাজে যে ভীষণ যুদ্ধ ও সংঘর্ষ সংঘটিত হয়, কুরুক্ষেত্র তাহারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন বা দৃষ্টান্ত। সেই যুদ্ধেরও গুপ্ত নেতা হইতেছেন মানবরূপে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান, সেই যুদ্ধের প্রধান যন্ত্র হইতেছেন সেই যুগের প্রতিনিধি মানব (representative man) ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, সেই যুদ্ধে ধন প্রাণ তুচ্ছ করিয়া, প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ, দৃঢ়পণের সহিত দণ্ডায়মান হইয়াছেন জগতের শ্রেষ্ঠ নরপতি ও যোদ্ধৃগণ, সেই যুদ্ধের ফলাফলের উপর একটা বিরাট দেশ, বিরাট জাতির, ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। এইরূপ ভীষণ সন্ধিক্ষণে জীবনের মহাসমস্যার সম্মুখীন হইয়া অর্জ্জুনের

ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, জ্ঞানী, বীরপুরুষও কিরূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতে পারেন, গীতায় প্রথমতঃ তাহা দেখান হইয়াছে। এইরূপ সন্ধিক্ষণে ভগবান কিরূপ ভাবে তাঁহার যন্ত্রগণকে পরিচালিত করেন, মানুষকে নিমিত্তমাত্র করিয়া জগতে ভগবদুদ্দেশ্য সাধন করেন, অর্জ্জুনসখা, সারথিরূপী শ্রীকৃষ্ণ তাহারই অনুপম নিদর্শন। এইরূপ সন্ধিক্ষণে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের চরম সমাধান কেমন করিয়া করিতে হয় তাহাই গীতার শিক্ষা।

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭॥

অন্বয়। [হে] দ্বিজোত্তম! অস্মাকং তু যে বিশিষ্টাঃ মম সৈন্যস্য নায়কাঃ, তান্ নিবোধ, তে সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি।

অনুবাদ। শুনুন দ্বিজোত্তম, আমাদেরও মধ্যে যে সকল বিশিষ্ট বীর আমার সৈন্যের নেতা, তাঁহাদের নাম আপনার অবগতির জন্য বলিতেছি।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়। ভবান্ ভীষ্মঃ চ, কর্ণঃ চ, সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপঃ চ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণঃ চ, তথা সৌমদত্তিঃ জয়দ্রথঃ, অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ [সন্তি তে] সর্ব্বে নানাশস্ত্র-প্রহরণাঃ যুদ্ধবিশারদাঃ।

অনুবাদ। আপনি ও ভীষ্ম, কর্ণ ও রণজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সোমদত্ত-তনয় ভূরিশ্রবা এবং জয়দ্রথ, আরও বহু বীর আমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ; ইঁহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত।

ব্যাখ্যা

ভবান্। নিজের বিশিষ্ট সেনানায়কগণের নাম বর্ণনা করিতে দুর্য্যোধন কৌশলের সহিত প্রথমেই দ্রোণাচার্য্যকে উল্লেখ করিলেন।

ভীষ্মশ্চ। যাঁহারা মহাভারত ও গীতাকে রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা গীতার এই অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—ভবান্—দ্রোণাচার্য্য, এখানে মলিন সংস্কার-জাত বুদ্ধি ; ভীষ্ম—চিদাভাস, মায়িক অহঙ্কার ; কর্ণ—রাগ ; কৃপ—অবিদ্যা ; অশ্বত্থামা—বাসনা ; বিকর্ণ—দ্বেষ ; সৌমদত্তি—কর্ম্মসংস্কার ; জয়দ্রথ—মৃত্যুভয়। এইরূপ খেয়ালমত উদ্ভট ব্যাখ্যা করিলে মহাভারতকে যেমন কাব্য-জগতে হীন স্থান দেওয়া হয়, তেমনিই গীতার গভীরতা,

কর্ম্ম-জীবনে উপযোগিতা ও মানবজাতির উৎকর্ষদায়ক সমুচ্চ শিক্ষাকে খর্ব্ব ও নষ্ট করা হয়। আমরা ক্রমশঃ দেখিব যে, গীতার ব্যাখ্যা করিতে এরূপ কষ্ট-কল্পনার কোন প্রয়োজনই নাই—সহজ ও স্বাভাবিক অর্থ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিলেই গীতার অত্যুচ্চ পরম কল্যাণকর আধ্যাত্মিক শিক্ষা বুঝিতে পারা যায়।

মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। এই কথায় দুর্য্যোধনের অহঙ্কার ও দম্ভ ফুটিয়া উঠিয়াছ—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, আরও কত যুদ্ধবিশারদ বীর নানা শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কৃতসঙ্কল্প, এই কথা বলিতে দুর্য্যোধনের বুক যেন ফুলিয়া উঠিতেছে।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০॥

অন্বয়। অস্মাকং তৎ অপর্য্যাপ্তং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্, এতেষাং তু পর্য্যাপ্তং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্।

অনুবাদ। ভীষ্ম আমাদের এই অপরিমিত সৈন্যদল রক্ষা করিতেছেন; আর তাহাদের পরিমিত সৈন্যদল ভীম রক্ষা করিতেছেন।

ব্যাখ্যা

অপর্য্যাপ্তং। এই শ্লোকে 'পর্য্যাপ্ত' ও 'অপর্য্যাপ্ত' শব্দের অর্থ লইয়া কিছু মতভেদ আছে। শ্রীধর স্বামী

প্রভৃতি কোন কোন ব্যাখ্যাকার 'পর্য্যাপ্ত' শব্দের অর্থ করিয়াছেন*—যথেষ্ট, সমর্থ ও প্রচুর এবং অপর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ করিয়াছেন—যথেষ্ট নহে, অসমর্থ, অপ্রচুর। এই অর্থ অনুসারে বুঝিতে হয় যে, দুর্য্যোধনের পক্ষে সৈন্যবল প্রচুর ছিল না, পাণ্ডবদের পক্ষে ছিল। কিন্তু মহাভারতের পূর্ব্বাপর কথা স্মরণ করিলে এরূপ অর্থ সমীচীন মনে হয় না। উদ্যোগ পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিজের সৈন্য বর্ণনা করিবার সময় দুর্য্যোধন বলিয়াছিলেন, "আমার সেনা বৃহৎ ও গুণসম্পন্ন, এই কারণে আমারই জয় হইবে।" কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবগণের সৈন্য সংখ্যায় কৌরবদের অপেক্ষা কম থাকায় পাণ্ডবগণ বজ্রনামক ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন এবং কৌরবদিগের অপার সেনা দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল, ইহা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব অপর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ "অসংখ্য, অপার বা অসীম" এবং পর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ ইহার বিপরীত "পরিমিত, ক্ষুদ্র" বুঝাই সমীচীন। অবশ্য দুর্য্যোধনের পক্ষের সেনা পাণ্ডবদের তুলনায় অসংখ্য বা অসীম ছিল না। পাণ্ডবদের ছিল সাত অক্ষৌহিণী* এবং কৌরবদের ছিল একাদশ অক্ষৌহিনী। তবে আত্মশ্লাঘী

* এক অক্ষৌহিনী সেনায় ২১,৮৭৯ হস্তী, ২১,৮৭০ রথ, ৬৫,৬১০ অশ্ব ও ১,০৯,৩৫০ পদাতিক সর্ব্বশুদ্ধ ২১৮৭০০ বুঝায়। এই হিসাবে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে উভয়পক্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৯,৩৬,৬০০ সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। সেই যুগের লোকসংখ্যা বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেকগুণ কম ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সে যুগে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে কিরূপ ভীষণ জাতিধ্বংস সংঘটিত হইয়াছিল।

দুর্য্যোধন নিজের পক্ষকে খুবই বড় বলিয়া দেখিতে ছিলেন এবং সেই অনুসারে স্ফীত হৃদয়ে "অসীম", "অপার" প্রভৃতি বিশেষণের প্রয়োগ করিতেছিলেন।

ভীষ্মাভিরক্ষিতম্। দুর্য্যোধন বলিতেছেন যে, তাঁহার পক্ষে কেবল সৈন্যসংখ্যাই অসীম নহে, তাঁহার সৈন্যের রক্ষকও পাণ্ডবদের রক্ষক অপেক্ষা বড়—কারণ, ভীম যত বড়ই যোদ্ধা হউক, গদাযুদ্ধে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্য্যোধন ভীমকে ভীষ্মের সমকক্ষ কিছুতেই ভাবিতে পারেন নাই। স্বয়ং দুর্য্যোধনই ভীম অপেক্ষা বাহুবলে ও যুদ্ধকৌশলে যে বড় ছিলেন, তাহা উভয়ের শেষ গদাযুদ্ধেই প্রমাণিত হইয়াছিল; অন্যায় যুদ্ধে উরুতে আঘাত করিয়া তবে ভীম দুর্য্যোধনকে জখম করিতে পারিয়াছিলেন। অতএব, উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যা এবং উভয় পক্ষের রক্ষক ভীষ্ম ও ভীমকে তুলনা করিয়া দুর্য্যোধন স্থির নিশ্চয় করিলেন যে তাঁহারই পক্ষে জয় অবশ্যম্ভাবী। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাহুবলে দুর্য্যোধনের পক্ষ বাস্তবিকই বড় ছিল এবং এই বিষয়ের হিসাব করিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি দুর্য্যোধনের কোন ভুলই হয় নাই। কিন্তু পাণ্ডবগণ বাহুবলে অপেক্ষাকৃত হীন হইলেও তাঁহাদের পক্ষ ন্যায়ের পক্ষ, ধর্ম্মের পক্ষ ছিল বলিয়াই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারাই জয়লাভ করিয়াছিলেন।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাহভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥১১॥

অন্বয়। সর্ব্বেষু চ অয়নেষু যথাভাগম্ অবস্থিতাঃ ভবন্তঃ সর্ব্বে এব হি ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু।

অনুবাদ। সকল দিকে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া আপনারা সকলেই ভীষ্মকেই রক্ষা করুন।

ব্যাখ্যা

যথাভাগমবস্থিতাঃ। দুর্য্যোধন কৌরবসেনা পরিচালনা করিতেছিলেন না, ভীষ্মই ব্যূহ রচনা করিয়া সকল যোদ্ধার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ভীষ্মই ছিলেন কৌরব সেনার রক্ষক, সেনাপতি। সেনাপতি ভীষ্ম যুদ্ধের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, নীতিকুশল রাজা দুর্য্যোধন তাহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই, তিনি কেবল নিজপক্ষের সৈন্যগণকে, বিশেষতঃ আচার্য্য দ্রোণাচার্য্যকে উৎসাহ দিতেছিলেন। তিনি জানিতেন যে, কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন হইতেছে,—যাহাকে যে কর্ত্তব্যের ভার দেওয়া হইবে, সে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সেই কর্ত্তব্য পালন করিবে। তাই দুর্য্যোধন সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত থাকিয়া, নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন, যথারীতি বীরধর্ম্ম পালন করুন।

ট্রাফালগারে ফরাসীদের সহিত যে নৌযুদ্ধে ইংরাজের ভাগ্য নির্ণীত হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে জগতের ইতিহাসের গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সেই মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেই ইংরাজ

সেনাপতি নেল্‌সন পতাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা ছিল—"England expects every one to do his duty!" "ইংলণ্ড আশা করে যে প্রত্যেক ইংরাজ আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে!" কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে এইরূপ কথা বলিয়াই দুর্য্যোধন নিজ সৈন্যকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু। দুর্য্যোধন বলিলেন, নিজেদের মৃত্যু হয় তাহাও স্বীকার তথাপি সকল দিক হইতে যাহাতে ভীষ্ম রক্ষিত হন, সকলে সেই চেষ্টাই করুন। ভীষ্মকে রক্ষা করার অর্থ, কৌরববাহিনীকে রক্ষা করা, কারণ ভীষ্মই সেই বাহিনীর প্রাণস্বরূপ নায়ক, রক্ষক। আপনাদিগকে বিপন্ন করিয়াও সকল রকম বিপদ হইতে নেতা বা নায়ককে রক্ষা করিতে হয়, দুর্য্যোধন এখানে সেই চিরন্তন নীতিরই উল্লেখ করিলেন।

লোকমান্য তিলক তাঁহার "গীতা রহস্যে" দুর্য্যোধনের এই উক্তির এক বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল, তিনি শিখণ্ডীকে দেখিলে অস্ত্রধারণ করিবেন না, এই কারণে শিখণ্ডীর দিক হইতে ভীষ্মের নিহত হইবার একান্ত সম্ভাবনা ছিল। দুর্য্যোধন অন্যস্থানে বলিয়াছেন,—

অরক্ষ্যমাণাং হি বৃকো হন্যাৎ সিংহং মহাবলং।
মা সিংহং জম্বুকেনৈব ঘাতয়েথাঃ শিখণ্ডিনা॥

"মহাবলবান সিংহ অরক্ষিত অবস্থায় থাকিলে সামান্য নেক্ড়ে বাঘ তাহাকে হত্যা করে; দেখ, জম্বুক সদৃশ শিখণ্ডীর দ্বারা সিংহকে নিহত হইতে দিও না।"

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥

অন্বয়। প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ তস্য হর্ষং সংজনয়ন্ উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য শঙ্খং দধ্মৌ।

অনুবাদ। উচ্চ সিংহগর্জ্জনে দুর্য্যোধনের হৃদয়ে হর্ষের সঞ্চার করিয়া কুরুবৃদ্ধ মহাপ্রতাপশালী পিতামহ ভীষ্ম নিজের শঙ্খ নিনাদিত করিলেন।

ব্যাখ্যা

কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ। ভীষ্ম ছিলেন কুরুজাতির প্রধান পুরুষ, দুর্য্যোধনাদির সম্পর্কে পিতামহ। বিপদ হইতে স্বজাতিকে রক্ষা করা যে ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য-প্রাণ রাজনীতিবিদ্ ভীষ্ম তাহা বেশই জানিতেন। কেবল যদি পাণ্ডবদের সহিতই দুর্য্যোধনের সংগ্রাম হইত তাহা হইলে ভীষ্ম কখনই সে যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন না। কিন্তু কুরু-পাণ্ডবের গৃহবিবাদের সুযোগ পাইয়া যখন কুরুদের প্রাচীন শত্রু ও সমকক্ষ সাম্রাজ্য-লিপ্সু পাঞ্চাল জাতির দ্বারা কুরুরাজ্য আক্রান্ত হইল এবং পাণ্ডবদের সহিত শান্তি স্থাপনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল তখন কুরুকুলের বৃদ্ধ নেতা ভীষ্ম সেনাপতি

নিযুক্ত হইয়া স্বীয় বাহুবলে চিররক্ষিত স্বজাতির গৌরব ও প্রাধান্যের শেষ রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

প্রতাপবান্। ভীষ্ম বয়সে বৃদ্ধ হইলেও অতিশয় বলশালী ছিলেন। শুধু ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতিতে যে তিনি বিশেষ পরিপক্ক ছিলেন তাহা নহে, আজন্ম কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তিনি যে বল সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার তুল্য শক্তিশালী পুরুষ তৎকালে আর কেহই ছিলেন না।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়। ততঃ চ শঙ্খাঃ ভের্য্যঃ চ পণবাঃ আনকাঃ গোমুখাঃ চ সহসা এব অভ্যহন্যন্ত, স শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ।

অনুবাদ। তখনই শঙ্খ, ভেরী, পনব (মাদল), আনক (ঢাক), গোমুখ (রণশিঙ্গা) সকল অকস্মাৎ এক সঙ্গে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, তাহাতে শব্দ হইল অতি ভয়ঙ্কর।

ব্যাখ্যা

কুরুক্ষেত্রে সমবেত সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য কিরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল এই শ্লোকে তাহা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। সকলেই প্রস্তুত, কেবল সেনাপতির ইঙ্গিত অপেক্ষা করিতেছিল। যেই ভীষ্ম সিংহবিক্রমে নিজের শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন, তৎক্ষণাৎ শুষ্ক পুঞ্জীকৃত বারুদে অগ্নিকণা সংযোগ

করিলে যেমন তুমুল বিস্ফোরণে দশদিক কাঁপিয়া উঠে, তেমনই কুরুক্ষেত্রের আকাশ বাতাস নিনাদিত করিয়া একসঙ্গে অসংখ্য রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল।

গীতা কিরূপ সহজ, সুললিত ও কাব্যোচিত ভাষায় গভীরতম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিলে অতীব বিস্মিত হইতে হয়। প্রথম অধ্যায়ে তত্ত্ব কথার আলোচনা নাই, কিন্তু রণভূমি কুরুক্ষেত্রের যে বর্ণনা আছে তাহা মহাকাব্য মহাভারতের কবিরই উপযুক্ত হইয়াছে। কয়েকটি মাত্র শ্লোকে যুগান্তকারী ভীষণ কুরুক্ষেত্রের জীবন্ত জাগ্রত ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ পক্ষীয় সৈন্য লইয়া রণক্ষেত্রে সমুপস্থিত, তৎকালীন ভারতের যত বিখ্যাত বীর ও নৃপতি একপক্ষে কিম্বা অপরপক্ষে দণ্ডায়মান, সমগ্র ভারত রুদ্ধনিশ্বাসে এই যুদ্ধের ফলাফলের দিকে চাহিয়া আছে, ভারতীয় মহাজাতির এ যে জীবন মরণ সন্ধিস্থল। দুই পক্ষ আপন আপন শক্তি ও বিদ্যা অনুসারে ব্যূহ রচনা করিয়াছেন, উভয় পক্ষের নেতাগণ যুদ্ধের প্রাক্কালে পরস্পরের বলাবল নিরীক্ষণ করিতেছেন। প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন সম্মুখে বিদ্যমান, ইহাতে যোদ্ধা ও নেতাগণের হৃদয়ে যে নানাভাবের উদয় হইয়াছে, দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুনের কথায় শ্রোতা বা পাঠকের মনেও সেই সকল ভাব সঞ্চারিত হইতেছে। ভীষ্মের সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনিতে যুদ্ধারম্ভ

সূচিত হইল, দিগ্বিদিক্ কম্পিত করিয়া রণবাদ্য ও অস্ত্রের ঝন্ঝনা বাজিয়া উঠিল—যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সেনাপতিগণ পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, সকলে ধনু উত্তোলন করিতেছেন, শরবর্ষণ আরম্ভ হইতেছে,—প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে —এমন সময় পাণ্ডবকুল-ভরসা মহাবীর অর্জ্জুনের শরীর সহসা থর থর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, ভয়ে শোকে বিষাদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইল, বিশ্ববিজয়ী সব্যসাচী অর্জ্জুনের হস্ত হইতে দেবদত্ত গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল—"আমি যুদ্ধ করিব না, করিতে পারিব না" সখা ও সারথী শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া শরধনু পরিত্যাগ করিয়া তিনি রথের উপর বসিয়া পড়িলেন।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ। ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ, প্রদধ্মতুঃ।

অনুবাদ। তখন শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত মহান্ রথ হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অতি উৎসাহের সহিত আপন আপন দিব্য শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন।

ব্যাখ্যা

ততঃ। কৌরবগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া যুদ্ধারম্ভ ঘোষণা করিবার পর পাণ্ডবগণ শঙ্খধ্বনি করিলেন, ইহাতে প্রকাশিত

হইতেছে যে, পাণ্ডবগণ প্রথমে দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয় নাই। •দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় কৌরবপক্ষ যখন আক্রমণের সূচনা করিল, তৎক্ষণাৎ পাণ্ডবপক্ষও প্রত্যুত্তরে অতি উৎসাহের সহিত শঙ্খধ্বনি করিয়া জানাইয়া দিল যে তাঁহারাও আত্মরক্ষা করিতে প্রস্তুত, অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হইলে অন্যায়কারীকে যথোচিত দণ্ড দিতে তাহারা মোটেই পশ্চাৎ-পদ হইবে না।

শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে—যে রথে অর্জ্জুন যোদ্ধা এবং শ্রীকৃষ্ণ সারথি সে রথও অসামান্য, সে রথের অশ্বও অসাধারণ। অর্জ্জুন নামের অর্থ শ্বেত, অর্জ্জুনের রথের অশ্বনিচয়ও শ্বেতবর্ণ। শ্বেতবর্ণ সাত্ত্বিকতার চিহ্ন। অর্জ্জুন রজঃপ্রধান বীর কর্ম্মী ছিলেন, কিন্তু তিনি অসুরের ন্যায় রাজসিক ছিলেন না। তাঁহার এই রজঃগুণের পশ্চাতে ছিল বিপুল সত্ত্ব, তাই তিনি ভগবানকে সখাভাবে পাইয়াছিলেন, ভগবানের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া দিব্যজীবনের পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ। ভগবানের সহিত জীবের যে নিত্য সম্বন্ধ, এক রথের উপর অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন তাহার সুন্দর বাহ্যিক দৃষ্টান্ত। পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ অন্তর্জগতের অতি গুহ্য কথা, ঐ সম্বন্ধ সাধারণকে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইলে এরূপ বাহ্যিক উপমা ও দৃষ্টান্ত একান্ত উপযোগী এবং বেদ, উপনিষদ্ বা পুরাণে এরূপ নানা দৃষ্টান্ত

দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও দেখা যায় ইন্দ্র (ভগবান) ও কুৎস (জীব) এক রথে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গের অভিমুখে চলিতেছেন ; কোথাও দেখা যায় এক বৃক্ষে দুইটী পক্ষী রহিয়াছে ; কোথাও দেখা যায় নর ও নারায়ণ দুই ঋষি জ্ঞানলাভের জন্য এক সঙ্গে তপস্যা করিতেছেন। এ সবই যে নিছক রূপক তাহা সহজেই বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রূপক নহেন, তথাপি তাঁহাদের সম্বন্ধ দেখিয়া ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ বেশ সুন্দরভাবে বুঝিতে পারা যায়। এই সম্বন্ধ শুধু জ্ঞানের সম্বন্ধ নহে, কর্ম্মেরও সম্বন্ধ। কিন্তু উপরে যে তিন প্রকার রূপকের কথা বলা হইয়াছে সেখানে জ্ঞানই হইতেছে চরম লক্ষ্য ; ভগবানের নিকট জ্ঞানলাভ করিয়া জীব কেমন ক্রমশঃ তাঁহার দিকে অগ্রসর হয়, ঐ সব রূপকের দ্বারা তাহাই বুঝান হইয়াছে। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একত্র হইয়াছেন যুদ্ধের জন্য, কর্ম্মের জন্য। অবশ্য গীতা বলিয়াছে যে, সকল কর্ম্ম শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞানেই পৌঁছাইয়া দেয়—সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। কিন্তু, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানচর্চ্চা করিবার জন্য কোন শান্তিময় আশ্রমে উপবিষ্ট হন নাই ; তাঁহারা ঘোর কর্ম্মের জন্য যোদ্ধা ও সারথিরূপে কুরুক্ষেত্রের শস্ত্রপাতসঙ্কুল মহারণস্থলে দিব্য রথোপরি দণ্ডায়মান। ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধও কেবল জ্ঞানের সম্বন্ধ নহে, হৃদিস্থিত হৃষীকেশ কেবল আমাদের জ্ঞানেরই গুরু নহেন, আমাদের কর্ম্মেরও ঈশ্বর,

তিনিই আমাদের সমস্ত কর্ম্ম পরিচালিত করিতেছেন; সমস্ত মানবজীবন সকল দ্বন্দ্ব, সকল কর্ম্মের ভিতর দিয়া তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে, তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃদ্, সংসারের সমস্ত কর্ম্মের ভিতর দিয়া তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে, সকল যজ্ঞ তপস্যার তিনিই ভোক্তা, মানুষ কেবল নিমিত্ত মাত্র। কর্ম্মের দিক দিয়া ভগবানের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ তাহা কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সম্বন্ধে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সকলেরই দেহরথে ভগবান সারথিরূপে বিরাজ করিতেছেন, জীবকে জীবনযুদ্ধে পরিচালিত করিতেছেন। বাজীকর যেমন আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া যন্ত্রের দ্বারা পুতুলকে নাচাইয়া থাকে, ভ্রম হয় বুঝি পুতুল আপনিই নাচিতেছে, তেমনিই অজ্ঞানের বশে আমরা মনে করি বুঝি আমরা স্বাধীনভাবে আমাদের সমস্ত কর্ম্ম করিতেছি, কিন্তু বস্তুতঃ আমরা ভগবানের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছি।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

ভগবান অর্জ্জুনকে দিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ করাইবেন, অর্জ্জুন বলিয়া বসিলেন তিনি যুদ্ধ করিবেন না। ভগবান উত্তর দিলেন,—

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥ ১৮।৫৯

অহঙ্কারের বশে তুমি মনে করিতেছ যুদ্ধ করিবে না, কিন্তু তোমার এ সঙ্কল্প বৃথা, প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধ করাবেই। মোহের বশে তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, অবশ হইয়া বাধ্য হইয়া তোমাকে তাহা করিতেই হইবে। এইরূপে ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কিছু করিতে পারে না, তবে যাহারা অজ্ঞানের বশে বিরোধিতা করে তাহারা নিজেরাই দুঃখ পায়। সাধারণতঃ মানুষ এই অজ্ঞান, অবিদ্যা, মায়ার প্রকৃতির বশে কর্ম্ম করে তাই ফলাফলে বদ্ধ হয়, মায়াধীন জীবনের অশেষ দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করে। অজ্ঞান অহঙ্কার বাসনাই এই মায়ার স্বরূপ—এই মায়া অতিক্রম করা অতিশয় কঠিন ; কেবল যাহারা ভগবানের শরণাপন্ন হয় তাহারাই এই মায়া অতিক্রম করিতে পারে। তখন আর অবশ হইয়া, অহঙ্কার ও বাসনার বশে কর্ম্ম করিয়া অশেষ দুঃখ পাইতে হয় না, তখন সজ্ঞানে ভগবানের লীলার সাথী হইয়া সংসারে ভগবানের কাজ করা যায়, এবং এই ভাবে যে কোন কাজই করা যাউক না কেন তাহাতে পাপ হয় না, তাহাতে বন্ধন হয় না, তাহা হয় দিব্য জ্ঞান শক্তি ও আনন্দের খেলা। অতএব সংসারের সকল সংশয়, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য স্বাধীন, আনন্দময় জীবন যাপন করিতে হইলে অর্জ্জুনের ন্যায়ই হৃদিস্থিত হৃষিকেশের শরণাপন্ন হইতে হয়,

—শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ২।৭

মাধবঃ। অর্জ্জুনের রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তিনি ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দূর করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিতে, দুষ্কৃতগণের বিনাশ সাধন করিয়া সাধুগণকে রক্ষা করিতে মানবদেহ গ্রহণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত প্রিয়সখা অর্জ্জুনকেই তাঁহার প্রধান যন্ত্র করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের অবতারণা তিনিই করিয়াছেন, সেই ধ্বংসলীলা তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে, এমন কি পূর্ব্ব হইতে তিনি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে মারিয়াই রাখিয়াছেন; কিন্তু অর্জ্জুন এ সব জানেন না। তিনি জানেন কৃষ্ণ মানুষ, কৃষ্ণ তাঁহার সখা, বিপদে সম্পদে তাঁহার প্রেমাস্পদ সহচর। সঙ্কট-সংশয়ে তিনি ছুটিয়া যাইয়া অকৃত্রিম বন্ধু কৃষ্ণের পরামর্শ গ্রহণ করেন, আবার রঙ্গকৌতুকের সময় তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া খেলা করেন, আনন্দ করেন; ভগবানও মানুষের সঙ্গে মানুষ হইয়া মানুষের মতই ব্যবহার করেন, আবার সকলের অজ্ঞাতে মহান্ যুগান্তকারী কর্ম্মের পরিচালনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে মহাকর্ম্মের অবতারণা করিয়াছেন, যাহারা সেই কর্ম্মের সহায় শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন, আবার যাহারা সেই কর্ম্মের বাধা, প্রতিবন্ধক, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাহাদের বিনাশের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কেহ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেছে, পূজা করিতেছে,

আবার কেহ তাঁহাকে বিপ্লবকারী, সমাজদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া গালি দিতেছে।

এই মহান্ ভাগবত কর্ম্মসাধনে শ্রীকৃষ্ণ নিজে বিশেষ কিছু করিতেছেন বলিয়া দেখা যায় না। তিনি নিজেকে অন্তরালে রাখিয়া অপরকেই কাজ করিতে দিতেছেন, অপরকে যন্ত্ররূপে, নিমিত্তরূপে ব্যবহার করিতেছেন, কেবল যখন বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইতেছে তখন আসিয়া মাঝে মাঝে পরামর্শ দিতেছেন, সান্ত্বনা দিতেছেন, সাহায্য করিতেছেন। সকলেই মনে করিতেছেন যে তাঁহারা নিজেরাই বুঝি সব করিতেছেন; এমন কি শ্রীকৃষ্ণের পরম বন্ধু, শ্রেষ্ঠ যন্ত্র অর্জ্জুনও বুঝিতেছেন না যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের হস্তের যন্ত্র মাত্র। যখন কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের মহাসন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইল, অর্জ্জুনের সমস্ত ধ্যান-ধারণা ধর্ম্মাধর্ম্মের আদর্শ ও নীতি ওলট-পালট হইয়া গেল, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন, আলোক শান্তি শক্তি ভিক্ষা করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত-সখার সম্মুখে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন, অর্জ্জুন তখনই বুঝিলেন যে, এতদিন তিনি যাঁহাকে মানব-সখা মাত্র মনে করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বের পরম নিধান, পুরুষ প্রধান, আদিদেব স্বয়ং ভগবান।

শ্রীকৃষ্ণের এই যে ব্যবহার, মানবজাতির সহিত ভগবানের ব্যবহার ইহারই অনুরূপ। ভগবানের মানবরূপে অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য ইহাই, অবতারের বাহ্য দৃষ্টান্তে মানুষ

ভগবান্‌কে বুঝিতে পারে, অবতারের জন্ম ও কর্ম্মের এই অপূর্ব্ব রহস্য যাহারা জানে তাহারাই সহজে ভগবানকে লাভ করিতে পারে।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৪।৯

নিজের জীবনের দিব্য আদর্শ দেখাইয়া মানুষকে ভগবানের দিকে, ভাগবত জীবনের দিকে আকৃষ্ট করাই অবতারের উদ্দেশ্য। জগতে অবতারই ভগবানের প্রতিনিধি, অবতারকে দেখিয়াই ভগবানকে জানা যায়, অবতারের শরণাপন্ন হওয়াই ভগবানকে লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। ভগবান মানুষকে যে পথে লইয়া যাইতে চান, অবতাররূপে নিজে আসিয়াই তিনি সেই পথ দেখাইয়া দেন। অবতার শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ ব্যবহার তাহা জীবের প্রতি ভগবানের সম্বন্ধ ও ব্যবহারের সুন্দর দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন পাণ্ডবদের সুহৃদ, ভগবান তেমনিই সর্ব্বভূতের সুহৃদ, সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং, অজ্ঞানান্ধ জীব এই পরম বন্ধু, পরম সখা শ্রীভগবানকে জানে না, চেনে না। ভগবান সাক্ষাৎভাবে নিজে কিছুই করেন না, জীবকে যন্ত্র করিয়া, জীবের ভিতর দিয়া জগতে নিজের ইচ্ছা, নিজের কার্য্য সম্পাদন করেন; কেবল যখন বিষম সঙ্কট উপস্থিত হয় তখন মাঝে মাঝে নিজে আসিয়া হস্তক্ষেপ করেন, জীবকে সাহায্য করেন, যে ধর্ম্মের ভিতর দিয়া জীব ক্রমশঃ তাঁহারই দিকে

অগ্রসর হইতেছে, সেই ধর্ম্মের বাধা ও গ্লানি দূর করিয়া দিয়া যান, মানুষকে ধর্ম্মপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান,—ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

মানুষ ইহা বুঝে না, নিজের কাজ করে, সমাজের কাজ করে, দেশের কাজ করে, ভাবে সব বুঝি নিজেরা নিজেদের জন্যই করিতেছে। এই অজ্ঞানের বশে কাজ করে বলিয়া তাহাদিগকে পদে পদে ব্যর্থ হইতে হয়, দুঃখ পাইতে হয়। কারণ, অহঙ্কার ও অজ্ঞানের বশে তাহারা ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতে থাকে। আবার যাহারা ভাগ্যক্রমে ভগবানের ইচ্ছার অনুকুলে চলে, ভগবানের কার্য্যেরই সহায় হয়, তাহাদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় বটে, কিন্তু জ্ঞানের অভাবে তাহারা ভগবানের সান্নিধ্য, ভগবানের বন্ধুত্ব, ভগবানের প্রেম উপলব্ধি করিতে পারে না। নিজেদের আসক্তি ও বাসনার বন্ধনে জড়াইয়া পড়িয়া অশেষ দুঃখ পায়, জীবনলীলায় যে পরম আনন্দ তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপ অজ্ঞানের বশে চলিতে চলিতে ধাক্কা খাইয়া অর্জ্জুনের ন্যায় যাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারেন, ভগবানের কৃপায় তাঁহাদের সমস্ত শোক, মোহ ও অজ্ঞান বিদূরিত হয় এবং অবিদ্যার আবরণ সরিয়া যায়; তখন তাঁহারা হৃদিস্থিত ভগবানের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইতে পারেন, তাঁহার দিব্যবাণী শ্রবণ করিতে, এবং তাঁহার দিব্য শক্তিতে পরিচালিত হইতে পারেন। এই

রূপে যখন মানুষ সাক্ষাৎভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হয়, তখন তাহার সমস্ত আধারের রূপান্তর সাধিত হয়; মানুষ-ভাব ছাড়াইয়া সে দেবভাব লাভ করে, ভগবানের প্রেমের অসীম মাধুর্য্য সে আস্বাদন করে, তখন তাঁহার সমস্ত জীবন হয় ভাগবত লীলার অবাধ বিকাশ, মানুষ হয় সচ্চিদানন্দেরই বিগ্রহ। ইহাকেই গীতা শ্রেষ্ঠ রহস্য বলিয়াছে, রহস্যং হ্যেতদুত্তমম।

আমাদের ভিতরে, অন্তরের অন্তঃস্থলে এই যে পরম সখা ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহাকেই চিনিতে হইবে; তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, জ্ঞানদীপেণ ভাস্বতা, উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ ভিতর হইতে জ্বালিয়া দিয়া তিনিই আমাদের সমস্ত সংশয় দূর করিয়া দিবেন, দিব্য জীবন লাভের পথে আমাদিগকে সুপরিচালিত করিবেন। ভিতরের ভগবানকে জানিবার সাধনা স্বরূপেই ভারতে প্রতিমাপূজা, অবতার পূজা, গুরুপূজা প্রচলিত আছে।

পাণ্ডবশ্চৈব। পাণ্ডব শব্দে এখানে অর্জ্জুনকেই বুঝাইতেছে। সে যুগে পাণ্ডবেরাই ছিলেন ধর্ম্মের রক্ষক, ধর্ম্মপুত্র, আদর্শ মানব; আবার পাণ্ডবদের পঞ্চভ্রাতার মধ্যে অর্জ্জুনই ছিলেন সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ। সাধুতায়, সাত্ত্বিকতায় যুধিষ্ঠির বড় ছিলেন, রাজসিক তেজে ভীম বড় ছিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের মধ্যে সত্ত্ব ও রজোগুণের যে সামঞ্জস্য হইয়াছিল তাহাতে তিনি ভগবানের অতীব প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়া-

ছিলেন, ভগবান তাঁহাকেই গীতোক্ত জ্ঞানের উপযুক্ত পাত্র নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মসংস্থাপনরূপ মহৎকর্ম্মে অর্জ্জুনকেই প্রধান যন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দশম অধ্যায়ে নিজের বিভূতি বর্ণনার সময় ভগবান বলিয়াছেন, পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জ্জুনেতেই তাঁহার শক্তির বিশিষ্ট প্রকাশ হইয়াছে,

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ। ১০।৩৭

দিব্যৌ শঙ্খৌ। গীতায় অর্জ্জুনকে দিব্য জীবনলাভের পথ দেখান হইয়াছে। মানুষ স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা যে অবস্থায় উপনীত হইলে তাহার পক্ষে সাধারণ মানুষের ভাব অতিক্রম করিয়া দেবভাব, দিব্য জীবন লাভ করা সম্ভব হয়, কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন যে দিব্য জীবন লাভের প্রকৃত অধিকারী তাহাই তাঁহার রথ, অশ্ব, শঙ্খ প্রভৃতির বর্ণনায় ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাঁহার রথ উত্তম, তাঁহার অশ্ব শ্বেত-বর্ণ, তাঁহার শঙ্খ দিব্য, তাঁহার গাণ্ডীব দেবদত্ত, তাঁহার সারথি দিব্যপুরুষ দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ।

প্রদধ্মতুঃ। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন প্রকৃষ্টভাবেই তাঁহাদের শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই আদর্শ কর্ম্মী, যে কর্ম্ম করিতে হয় খুব ভাল করিয়াই করেন, ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥১৬॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮॥

অন্বয়। হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং, ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ। কুন্তিপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং, নকুলঃ সহদেবঃ চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ (দধ্মৌ)। পরমেষ্বাসঃ কাশ্যঃ চ, মহারথঃ শিখণ্ডী চ, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটঃ চ অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ. [হে] পৃথিবীপতে! দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ, মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ, সর্ব্বশঃ পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ।

অনুবাদ। হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য, ধনঞ্জয় দেবদত্ত, ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ ধ্বনিত করিলেন। কুন্তিপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন। পরম ধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট এবং অজেয়

যোদ্ধা সাত্যকী, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রাতনয়, সকলেই চারিদিক হইতে স্ব স্ব শঙ্খ বাজাইলেন।

ব্যাখ্যা

এই অধ্যায়েরই শেষাংশে বলা হইবে যে, স্বজনগণকে যুদ্ধার্থে সমবেত দেখিয়া অর্জ্জুনের দেহ-মন-প্রাণের ভিতর অপূর্ব্ব বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এখানে শঙ্খধ্বনির বর্ণনাচ্ছলে অর্জ্জুনের স্বজনগণের প্রধান কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়াণি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥১৯॥

অন্বয়। সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ নভঃ চ পৃথিবীং চ এব অভ্যনুনাদয়ন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।

অনুবাদ। সেই ভীষণ শব্দ আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

ব্যাখ্যা

পাণ্ডব পক্ষের ভীষণ শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন পক্ষীয়গণের হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। এই মহাভীতির সঞ্চার তাহাদের পরাজয়ের পূর্ব্বলক্ষণ।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥২০॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥

অন্বয়। [হে] মহীপতে, অথ শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে (সতি) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্টা ধনুঃ উদ্যম্য তদা হৃষীকেশম্ ইদং বাক্যম্ আহ ॥

অনুবাদ। হে মহীপতে, কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধোদ্‌যোগে প্রস্তুত দেখিয়া শস্ত্রপাতের প্রারম্ভ সময়ে ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন।

কপিধ্বজঃ। অর্জ্জুনের পতাকায় মহাবীর ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানের মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল, সেইজন্য তাঁহাকে কপিধ্বজ বলা হইয়াছে।

প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে। এইখানে যে অবস্থার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিষম সন্ধিক্ষণ। বিনাযুদ্ধে এই ভীষণ গৃহবিবাদ মীমাংসার সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইয়াছে, দুই পক্ষ যুদ্ধার্থে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়া কুরু-ক্ষেত্রে সমুপস্থিত, রণস্থলে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াও কাহারও কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই, কুরুপক্ষ শঙ্খধ্বনির দ্বারা যুদ্ধারম্ভ সূচনা করিয়াছে, পাণ্ডবপক্ষ প্রত্যুত্তরে শঙ্খধ্বনি করিয়া নিজেদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিয়াছে, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যুদ্ধের জন্য উন্মুখ, সকলেই শস্ত্র নিক্ষেপের জন্য অস্ত্রোত্তলন করিতেছে, অর্জ্জুনও সেই মহা-সন্ধিক্ষণে তাঁহার দেবদত্ত গাণ্ডীব তুলিয়া ধরিলেন। এখনও অর্জ্জুনের মনে কোনরূপ দ্বিধা নাই, তিনি জানেন দুর্য্যোধন-

পক্ষ অধর্ম্মপক্ষ, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দমন করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। অর্জ্জুন চিরকাল এই ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন, আজ আবার সেই পরম শ্রেয়স্কর ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালনের উপযুক্ত ক্ষেত্র, স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্, সমুপস্থিত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় উৎসাহে নাচিয়া উঠিয়াছে, রণোল্লাসে তাঁহার হস্তের গাণ্ডীব ধনু উত্তোলিত হইয়াছে, তিনি তখন বীরোচিত গর্ব্বভরে সারথিকে রথ অগ্রসর করাইতে আদেশ দিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥২১॥
যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩॥

অর্জ্জুন উবাচ

অন্বয়। [হে] অচ্যুত, যাবৎ অহং যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ এতান্ নিরীক্ষে [তাবৎ] উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয়। অস্মিন্ রণসমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্, অত্র দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ যে এতে সমাগতাঃ [তান্] যোৎস্যমানান্ অহং অবেক্ষে।

অনুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, হে অচ্যুত, তুই সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ রাখ, যুদ্ধার্থিগণকে আমি দেখিয়া লই। দেখি এই সমরোৎসবে কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, কাহারা দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া এখানে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে।

ব্যাখ্যা

রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত। নিখিল-ভুবনের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানকে অর্জ্জুন সামান্য ভৃত্যের ন্যায় আদেশ করিলেন—"উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ লইয়া চল।" ভক্তের বোঝা ভগবান কেমন ভাবে বহন করেন, যে তাঁহার ভজনা করে ভগবান তাহাকে কেমন ভজনা করেন, প্রয়োজন হইলে ভৃত্যের ন্যায় আদেশ পালন করেন, পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। অনন্যচিত্ত হইয়া যে ব্যক্তি ভগবানের উপাসনা করে ভগবান তাহার সকল অভাব দূর করিয়া দেন, সকল ভার বহন করেন,

> অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
> তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥৯॥২২

যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং—অর্জ্জুন যুদ্ধার্থী বিপক্ষ সৈন্যগণকে দেখিতে চাহিলেন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ের জন্য নহে, দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধ করা যে কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই তাহার মনে উঠে

নাই। ক্ষত্রিয় বীর অগ্রসর হইয়াই শত্রুর সম্মুখীন হয়, শত্রুর মুখের দিকে চাহিয়া সাম্‌নাসামনি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করে। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে উদ্যত, ধনু উত্তোলন করিয়াছেন, কেবল অস্ত্রক্ষেপণের পূর্ব্বে তিনি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে চান যে, এই সমরোৎসবে কাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিজয়গর্ব্ব লাভ করিতে হইবে। এরূপ যুদ্ধকে তিনি গ্রাহ্যই করেন না, অবলীলাক্রমে এই যুদ্ধ তিনি জয় করিবেন, এই যুদ্ধক্ষেত্র তাঁহার পক্ষে ক্রীড়াক্ষেত্র মাত্র, এখন পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের মনের ভাব এইরূপ।

কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যম্—"আমি জগজ্জয়ী বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, আমার সহিত যুদ্ধ করিতে চায় এমন স্পর্দ্ধা কাহার আছে?"—অর্জ্জুনের এই ভাব ক্ষত্রিয়বীরোচিত গর্ব্ব ও উৎসাহের ভাব।

ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধেঃ—অর্জ্জুন কর্ম্মবীর, কিন্তু তিনি তাঁহার কর্ম্মকে সাত্ত্বিক আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন। অর্জ্জুনের এই যুদ্ধে এত উৎসাহের কারণ তিনি জানেন যে ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ,—দুর্য্যোধনের পক্ষই অধর্ম্মের পক্ষ, অন্যায়ের পক্ষ। যুদ্ধেই বীরের আনন্দ, তাহার উপর ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ, দুষ্টবুদ্ধি অত্যাচারীর দমনের জন্য যুদ্ধ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এমন সৌভাগ্য আর কি আছে?

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।

যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ—অর্জ্জুন যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহারা অধর্ম্মের অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতে আসিয়াছে, দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে সম্মুখ সমরে পরাস্ত করা তাঁহার পক্ষে পরম ধর্ম্ম, অর্জ্জুনের মনে এই কথাটাই বিশেষভাবে জাগরূক রহিয়াছে।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষিকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫

সঞ্জয় উবাচ

অন্বয়—[হে] ভারত! গুড়াকেশেন এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে রথোত্তমমং স্থাপয়িত্বা ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্ উবাচ, "হে পার্থ, এতান্ সমবেতান্ কুরূন পশ্য"।

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন, হে ভারত, হৃষীকেশকে অর্জ্জুন ঐ কথা বলিলে হৃষিকেশ উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে সেই উত্তম রথ স্থাপন করিলেন, এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও সমস্ত নৃপতিবৃন্দের সম্মুখে বলিলেন, "হে পার্থ, সমবেত এই সব কুরুগণকে দেখ।"

হৃষীকেশো গুড়াকেশেন—এখানে হৃষীকেশ ও গুড়াকেশ এই দুই শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ দেখা যায়। ইন্দ্রিয়সকল মনুষ্যকে আনন্দ দেয় বলিয়া তাহাদিগকে হৃষীক বলে। তাহা হইলে হৃষীক+ঈশ=হৃষীকেশ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গণের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ। তেমনই গুড়াকা শব্দের অর্থ নিদ্রা বা আলস্য; তাহা হইলে গুড়াকা+ঈশ=গুড়াকেশ, অর্থাৎ যিনি নিদ্রা বা আলস্যকে জয় করিয়াছেন, অর্জ্জুন। এই দুই শব্দের ব্যুৎপত্তি অন্য প্রণালীতেও স্থির হইতে পারে, যথা হৃষী+কেশ=হৃষীকেশ, অর্থাৎ আনন্দে দণ্ডায়মান যাহার চুল। তেমনই গুড়া+কেশ=গুড়াকেশ, গুড়া অর্থাৎ গূঢ় বা ঘন যাঁহার কেশ তিনিই অর্জ্জুন। কেশ অর্থে কিরণও বুঝা যায়, নিজের বিভূতিসমূহের কিরণদ্বারা সমস্ত জগতে আনন্দ প্রদান করেন, তাই উঁহাকে হৃষীকেশ বলা যায়। এইরূপে কেশব শব্দও কেশ অর্থাৎ কিরণ শব্দ হইতে উৎপন্ন বুঝা যাইতে পারে।

হৃষীকেশ বলিতে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে এবং গুড়াকেশ বলিতে অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঠিক কি অর্থে গীতাকার এখানে এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বলা কঠিন। বাস্তবিক গীতা যখন রচিত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে আমরা এখন এতদূরে চলিয়া আসিয়াছি, তখনকার মানুষ, তখনকার ভাব ও ভাষা হইতে এখনকার মানুষ ও ভাব ও ভাষা এত বিভিন্ন যে, গীতাতে

প্রত্যেক কথা কি ভাবে, কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সর্ব্বত্র তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। এক একটি কথার, এক একটি শ্লোকের অর্থ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে, ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের মধ্যে অশেষ মতভেদ হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। বাস্তবিক গীতার অর্থ লইয়া চুল চিরিয়া ব্যাখ্যা করিয়া পাণ্ডিত্য দেখানতে কোন লাভই নাই। আমরা যত ব্যাকরণ ও অভিধান খুলিয়া বসি না কেন, যত ভাষ্য ও টীকা তুলনায় সমালোচনা করি না কেন, সকল স্থানে যে আমরা গীতার মূল অর্থ ধরিতে পারিব তাহা কখনই সম্ভব নহে। দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কর্ম্মবাদী, ভক্তি-বাদী, মায়াবাদী সকলেই যে গীতাকে আপন আপন মতের প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করে এবং আপন আপন মতের সমর্থন করিয়া গীতার ব্যাখ্যা করে ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, সকল ক্ষেত্রে গীতার ভাষা, গীতার ভাব, গীতার মতের সঠিক অর্থোদ্ধার করা অসম্ভব। এমন কি শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্বাচার্য্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাকার আপন আপন মতানুসারে যে গীতার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সময় হইতেও আমরা এতদূরে সরিয়া আসিয়াছি, তাঁহাদের মনোভাব, তাঁহাদের ধ্যান ও ধারণা পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে আমরা এত বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছি যে তাঁহাদের মতও ঠিক বুঝিয়া উঠা এখন আর সম্ভব নহে। তাহা হইলে আমরা গীতা পড়িব কি করিয়া? গীতাপাঠের ফললাভ করিব কি উপায়ে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পাণ্ডিত্যের সহিত দার্শনিক মত বা ব্যাকরণের আলোচনা করিবার নিমিত্ত গীতাপাঠ করিয়া কোন লাভই নাই। তাহাতে বুদ্ধির কতকটা কসরৎ হইতে পারে বটে কিন্তু, সাধন জীবনে, আধ্যাত্মিক জীবনে আমরা কোন ফলই লাভ করিতে পারিব না। অতএব গীতার সকল কথার মূল অর্থ, গীতার সকল দার্শনিক তত্ত্বের সঠিক স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া, গীতার মধ্যে যে সকল সনাতন সত্য নিহিত রহিয়াছে আমাদিগকে সেইগুলি গ্রহণ করিতে হইবে। তৎকালীন ভাব ও ভাষার ভিতর দিয়া গীতা মানব জীবনের সনাতন সত্যসমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছে। সেই ভাব ও ভাষা বর্ত্তমানের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে, তবে তাহাদের ভিতর দিয়া যে সকল সনাতন সত্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সকল যুগের, সকল মানুষের জীবন গঠনের পক্ষেই উপযোগী। দিব্য আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে সহায়তা হয় এমন সত্য গীতাতে কত নিহিত রহিয়াছে—গীতাকে সেই সকল সত্যের রত্নাকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই খাঁটি রত্নের দুই একটি গ্রহণ করিতে পারিলেও আমাদের জীবন সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে। এই সত্যরূপ মহারত্ন যে যত লইতে চায়, গীতার মধ্যে ততই পাইবে।

কিন্তু গীতা হইতে এই রত্ন কেমন করিয়া উদ্ধার করিতে হয়? কে আমাদিগকে এই সকল অমূল্য রত্নের সন্ধান দিবে? কেবলমাত্র দার্শনিক বা বৈয়াকরণিক পণ্ডিতদের

দ্বারা তাহা কখনই সম্ভব নহে। বর্ত্তমান যুগে সাধনার দ্বারা যাঁহারা সত্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই গীতার ব্যাখ্যা শুনিতে হইবে।

গীতাই বলিয়াছে—

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ।৪।৩৫

তর্কবুদ্ধি, বিচারবুদ্ধি লইয়া পণ্ডিতদের কাছে গীতার আলোচনা করিতে যাইলে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা যায় না। ভক্তির সহিত জিজ্ঞাসু হইয়া তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে হয়, তাহা হইলেই গীতার অমৃতমাখা শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য হইতে পারে।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে—উভয় সেনার মধ্যস্থলে। এই কথাটি ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনের মুখেও শুনিতে পাইয়াছি, সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত। গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে এক মহা সন্ধিক্ষণে ও সন্ধিস্থলে, ইহাই এই সকল কথায় পরিস্ফুট হইয়াছে। যুদ্ধারম্ভ হইতেছে, প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে, এরূপ সময়ে অর্জ্জুনের রথ আসিয়া উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইল ; পার্শ্বে বা দূরে থাকিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাওয়া তত কঠিন নহে, কিন্তু অর্জ্জুন যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার যে আর ফিরিবার পথ নাই। তথাপি অর্জ্জুন যুদ্ধত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহার বিষাদ ও মোহ এতই গভীর হইয়াছিল।

আর, এই সন্ধিস্থল কেবল বাহ্যিক স্থান ও কালের সন্ধিস্থল নহে, ইহা অর্জ্জুনের জীবনেরও মহাসন্ধিস্থল। • অর্জ্জুন জীবনে এতদিন যাহা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা ভগবানের দ্বারা চালিত হইয়াই করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য জীবের ন্যায় অজ্ঞানে করিয়াছেন, যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া, মায়ার হাতে অবশ যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু মনে করিয়াছেন যে, নিজেই বুঝি সব করিতেছেন। এখন ভগবান অর্জ্জুনকে সজ্ঞানে নিজের লীলার সাথী করিতে চান, সাধারণ কর্ম্মীর অবস্থা হইতে তাঁহাকে তুলিয়া দিব্য কর্ম্মী করিতে চান। এখনও অর্জ্জুনের মধ্যে অহঙ্কার আছে, আসক্তি আছে, বাসনা আছে, ফলকামনা আছে, আপন পর জ্ঞান আছে, এই সব থাকিতে কেহ দিব্যকর্ম্মী হইতে পারে না, স্বাধীন কর্ম্মী হইতে পারে না, ভগবানের লীলার নিখুঁত যন্ত্র হইতে পারে না। এই সকল অশুদ্ধি ও অজ্ঞান অর্জ্জুনের মধ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সেগুলিকে তীব্রভাবে ফুটাইয়া তুলিবার উদ্‌যোগ করিলেন।

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ—অর্জ্জুনের আদেশ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ উভয় সৈন্যের মধ্যে এমন স্থানে রথ স্থাপন করিলেন যেন অর্জ্জুন সম্মুখেই পরম পূজার্হ গুরু ভীষ্ম ও দ্রোণকে দেখিতে পান এবং আপনার অতি আত্মীয় ও স্বজন নরপতি ও যোদ্ধাগণকেও দেখিতে পান। গুরু ও স্বজনগণের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিতে অর্জ্জুন হয়ত পশ্চাৎপদ হইতে পারেন, এ সন্দেহ

ধৃতরাষ্ট্রের মনে উঠিয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রকৃতি ভালরূপেই জানিতেন, তাই তাঁহার অন্তর্নিহিত সমস্ত মোহ, মমতা, দৌর্ব্বল্য যাহাতে একেবারে ফুটিয়া বাহির হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দূর করিয়া দিবার সুযোগ পান, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এমনভাবে রথ স্থাপন করিলেন যেন অর্জ্জুন একেবারেই সমবেত কুরুগণকে অতি সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পান।

"পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূন"। যাদুকর মন্ত্রের দ্বারা যেমন মানুষকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলে, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সন্ধিস্থলে শ্রীকৃষ্ণের এই কথাগুলি যেন তেমনিই মহাবীর অর্জ্জুনকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। অর্জ্জুনের ভিতরে সমস্ত শোক, মোহ, ভয়, সন্দেহ, ক্লৈব্য, দুর্ব্বলতার দ্বার একেবারে খুলিয়া গেল, এই মাত্র যে বীর গর্ব্বিত হৃদয় আসন্ন যুদ্ধোৎসবের বিপুল আনন্দে নৃত্য করিতেছিল, সহসা সে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল, জগজ্জয়ী বীর অর্জ্জুনের সর্ব্বাঙ্গে প্রবল জ্বরের লক্ষণ দেখা দিল, শোকে, মোহে, ভয়ে অভিভূত হইয়া তিনি রথের উপর বসিয়া পড়িলেন।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬

অন্বয়। পার্থঃ তত্র উভয়োঃ অপি সেনয়োঃ [মধ্যে] স্থিতান্ পিতৄন অথ পিতামহান্ আচার্য্যান মাতুলান্ ভ্রাতৄন পুত্রান্ পৌত্রান্ তথা সখীন্ শ্বশুরান্ সুহৃদঃ চ এব অপশ্যৎ।

অনুবাদ। সেখানে পার্থ দেখিলেন পিতা, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর ও সুহৃদগণ উভয় সেনার মধ্যেই রহিয়াছেন।

ব্যাখ্যা

তত্রাপশ্যৎ। সেখানে পার্থ কি দেখিলেন ? তাঁহার মন যদি অহংকার ও মায়ার বশ না হইত, চিত্তশুদ্ধির ফলে জ্ঞান ও সমতা লাভ করিয়া যদি তিনি নিজকে ভগবানের নিখুঁত যন্ত্র করিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি শুধু দেখিতেন যে, তাঁহার সম্মুখে যাহারা উপস্থিত, তাহারা ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম স্থাপনে সহায়তা করিতে হইবে, জগতে ভগবানের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। কিন্তু অর্জ্জুন এখনও এই বিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাই সম্মুখে যাহাদিগকে দেখিলেন তাহাদিগকে "স্বজন" বলিয়া, "আপনার লোক" বলিয়াই দেখিলেন। এই যে অহঙ্কার, এই অজ্ঞান অহংভাব, ইহাই যত দুঃখের, যত অনর্থের মূল,—কুরুক্ষেত্রের সন্ধিক্ষণে অর্জ্জুন যে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহার মূল কারণ এই অহংভাব, এই অবিদ্যা। দিব্যজীবন লাভ করিতে হইলে এই

অহংভাব ছাড়াইয়া উঠিতেই হইবে, মানুষের সহিত লৌকিক সম্বন্ধ ছাড়াইয়া জীবের সহিত ভগবানের যে প্রকৃত সম্বন্ধ তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ভগবান অর্জ্জুনকে সেই দিব্য অবস্থায় তুলিতে চান; তাই অর্জ্জুনকে এখানে প্রথমেই অহংভাবের বিষময় ফল উপলব্ধি করাইতেছেন।

পিতৄনথ পিতামহান্। পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি বলিতে এখানে পিতৃস্থানীয়, পিতামহস্থানীয় লোক বুঝাইতেছে। অর্জ্জুন দেখিতে লাগিলেন তাঁহার সম্মুখে যাহারা উপস্থিত তাহাদের কাহার সহিত তাঁহার আত্মীয়তার কি সম্বন্ধ; কেহ পূজনীয় গুরু, কেহ পুরাতন বন্ধু, কেহ পিতৃব্য, কেহ পিতৃতুল্য, কেহ পুত্রতুল্য ইত্যাদি।

সুহৃদশ্চৈব। এখানে সখা ও সুহৃদের মধ্যে প্রভেদ করা হইয়াছে। সখা বলিতে সঙ্গী, সহকর্ম্মী বুঝায়। সুহৃদ বলিতে বুঝায় যিনি উপকার করেন, সাহায্য করেন, মঙ্গল-কামী, হিতকামী।

সেনয়োরুভয়োরপি। অর্জ্জুন দেখিলেন আত্মীয় স্বজন যে কেবল তাঁহার নিজের পক্ষেই আছে তাহা নহে, বিপক্ষ-গণের মধ্যেও রহিয়াছে। অর্জ্জুন দেখিতে পাইলেন, একই দেশের লোক, একই জাতির লোক পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে, এই ভীষণ অন্তর্বিরোধ ও গৃহবিচ্ছেদে একই পরিবারের লোক পরস্পরকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধুনবস্থিতান।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭

অন্বয়। সঃ কৌন্তেয়ঃ অবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধুন্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদন্ ইদম্ অব্রবীৎ।

অনুবাদ। কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন সেই সকল আত্মীয় কুটুম্বগণকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত অবলোকন করিয়া অতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন এবং বিষাদগ্রস্ত হইয়া এই কথা বলিলেন।

ব্যাখ্যা

তান্ সমীক্ষ্য। অর্জ্জুন উভয় সেনার মধ্যে যে সকল আত্মীয় স্বজনকে উপস্থিত দেখিলেন তাহারা যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান করিবে সে কথা অর্জ্জুনের অবিদিত ছিল না। অর্জ্জুন জানিতেন যে, রাজ্য লইয়া কুরুপাণ্ডবে সংগ্রাম বাধিলে অতি নিকট আত্মীয় স্বজনের সহিতই সংগ্রাম করিতে হইবে। কিন্তু এই গৃহ বিবাদ, ভ্রাতৃবিরোধ যে বাস্তবিক পক্ষে কি ভীষণ তাহা তিনি চক্ষে দেখিবার পূর্ব্বে সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহা অর্জ্জুনের প্রকৃতিরই অনুযায়ী, কারণ তাঁহার প্রকৃতিতে ভাবুকতা প্রবল ছিল না। যাহারা সংসারের অশুভ ও অনিত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সংসার হইতে বিমুখ হইতে চান, আত্মচিন্তার দ্বারা জগতের এই গভীর রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে চান, অর্জ্জুন তাঁহাদের ন্যায় জিজ্ঞাসু, চিন্তাশীল, জ্ঞানার্থী ব্যক্তি নহেন।

তিনি কর্ম্মবীর, কর্ম্মের ডাক তাঁহার নিকট খুবই প্রবল, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তাঁহার নিকট বড়ই প্রিয়, কিন্তু এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যে কি ভীষণ নৃশংস অবস্থার মধ্যে মানুষকে ফেলিতে পারে অর্জ্জুন তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই।

দুর্য্যোধনাদি অতি অন্যায়ভাবে পাণ্ডবগণকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহারা উচ্ছৃঙ্খল, অত্যাচারী, আততায়ী; যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে হইবে, জগতে ন্যায়ের, ধর্ম্মের, সুনীতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এই ভাব অর্জ্জুনেব প্রাণ মনকে এমনভাবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল যে তিনি বাস্তব কুরুক্ষেত্রের ভীষণ পরিণামের কথা সম্পূর্ণভাবে ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই। কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্যাপারটী তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন, সমবেত আত্মীয় স্বজনকে চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া এই গৃহবিবাদের ভীষণ নৃশংসতা তাঁহার সম্যক উপলব্ধি হইল, তখন তাঁহার মাথায় অকস্মাৎ যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাঁহার দেহ প্রাণ, মন অসহ্য যন্ত্রণায় বিকল হইয়া উঠিল।

সর্ব্বান্ বন্ধূন্। বন্ধু শব্দের অর্থ এখানে কেবল সখা বা সুহৃদ নহে। যাহাদের সহিত রক্তের সম্পর্ক আছে, বৈবাহিক সম্পর্ক আছে, বন্ধুত্বের সম্বন্ধ, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ, এক কথায় সামাজিক মনুষ্যের পক্ষে যে সব মিষ্ট সম্বন্ধ, স্নেহের সম্বন্ধ, পবিত্রতার সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা সকলেই এখানে যুদ্ধার্থে উপস্থিত।

কৃপয়াপরয়াবিষ্টো—এখানে কৃপার অর্থ দয়া বা করুণা নহে। প্রকৃত দয়া বা করুণা খুব উচ্চভাব। প্রকৃত প্রেমের উপর তাহার ভিত্তি—তাহাতে আছে সর্ব্বভূতের মঙ্গল করিতে উৎসাহ, আনন্দ, শক্তি। তাহা যেমন নির্য্যাতিতকে রক্ষা করিতে অগসর হয়, তেমনই অত্যাচারীকে, আততায়ীকে সাজা দিতে, বিনাশ করিতে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হয় এবং অত্যাচারীকে এইরূপে বাধা দিতে, নিরস্ত করিতে তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরাগ বা ঘৃণার উদয় হয় না। এরূপ দয়া দেবোচিত গুণ, ইহাতে মানুষের প্রাণ মন অবসন্ন হয় না, পরন্তু অপূর্ব্ব শক্তি ও উৎসাহেরই সঞ্চার হয়। কিন্তু অর্জ্জুনের কৃপা এরূপ উচ্চভাব নহে। আত্মীয়-স্বজনের শোকে অর্জ্জুন অধীর, আত্মীয় স্বজনকে স্বহস্তে বধ করিতে তাঁহার প্রাণে যে যন্ত্রণা হইবে, অর্জ্জুন প্রকৃত পক্ষে নিজের সেই যন্ত্রণার ভয়ে অস্থির। এই শোক ও ভয় অর্জ্জুনকে অতিমাত্রায় চাপিয়া ধরিল, তাই তিনি কর্ত্তব্যের সম্মুখে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

বিষীদন্—বিষাদ শব্দে বাংলা ভাষায় সাধারণভাবে দুঃখ, মনের কষ্ট, বিমর্ষতা বুঝায়। কিন্তু অর্জ্জুনের বিষাদ খুব গভীর জিনিস। ইহা শুধু তাঁহার মনকেই বিমর্ষ করে নাই, ইহা তাঁহার বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে, প্রাণকে ব্যাকুল করিয়াছে, দেহকে সম্পূর্ণভাবে অবশ ও অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। অর্জ্জুনের বিষাদের প্রধান লক্ষণ হইতেছে

অবসাদ, হতাশ, জীবনে বিতৃষ্ণা, কর্ম্মে নিরুৎসাহ। মানুষ সাধারণতঃ যে সব ভাব, আদর্শ, আশা লইয়া উৎসাহের সহিত সাংসারিক জীবন যাপন করে, অর্জ্জুন এতদিন যে সকল অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, সেই সব এখন অর্জ্জুনের সম্মুখে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাই অর্জ্জুন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ভগবান অর্জ্জুনকে এই সব ভাব ছাড়াইয়া, জীবনের দিব্য ভাব, দিব্য আদর্শ দিতে চান, তাই প্রথমেই সাধারণ ভাবের অপূর্ণতা ও দুর্ব্বলতা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। ইহাই অর্জ্জুনের বিষাদের নিগূঢ় রহস্য, বিষাদযোগ।

কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে অর্জ্জুন যেমন ভীত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, জীবনযুদ্ধেও মানুষকে ঠিক তেমনিই অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়। ভগবান সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, মানবজীবন সম্বন্ধে আমরা একটা মোলায়েম্ ধারণা করিয়া রাখিয়াছি, এ জগতে ধর্ম্মেরই জয়, ন্যায় পথেই সুখ, কর্ত্তব্য পালনেই শান্তি, যতদিন আমাদের এই সব ধারণায় বিশেষ আঘাত না লাগে ততদিন আমরা লৌকিক, সামাজিক কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিয়া বেশ অগ্রসর হই। কিন্তু এই যে আমরা জগৎকে ভাবি যে একটা ধর্ম্মের রাজ্য, প্রেমের রাজ্য, শান্তির রাজ্য, এবং একটু আধটু ইহার ব্যতিক্রম দেখিলে কোন রকমে চোখ বুজিয়া থাকিয়া বা মনকে চোখ ঠারিয়া আমাদের ভিতরের বিশ্বাস ও নিশ্চিন্ততাকে বজায় রাখিয়া চলি, কারণ তাহাতে একটা সোজাসুজি

নীতি ধরিয়া, আদর্শ ধরিয়া আমাদের কাজ করিয়া যাইবার সুবিধা হয়, ইহা জগতের প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ অনুযায়ী নহে। জগতে মিলন অপেক্ষা দ্বন্দ্ব, প্রেম অপেক্ষা হিংসা, ন্যায় অপেক্ষা অন্যায়, জীবন অপেক্ষা মৃত্যু, সুখ অপেক্ষা দুঃখ, কোন অংশেই কম নহে, এই জগতের যিনি কর্ত্তা তাঁহাকে আমরা যে কোমলহৃদয়, দয়াময়, ন্যায়পরায়ণ বলিয়া কল্পনা করি, দৃঢ় সততার সহিত জগৎকে দেখিলে সে বিশ্বাস রক্ষা করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে। জগতে নির্দ্দোষীর উৎপীড়ন, পাপের জয়, ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা দেখিয়া কত লোককে না বলিতে হইয়াছে যে, এ জগতে দয়া নাই, মায়া নাই, ন্যায় নাই, ধর্ম্ম নাই! ধর্ম্মপ্রাণ উচ্চহৃদয় কর্ত্তব্যপরায়ণ অর্জ্জুন তাঁহার স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িলেন যখন তাঁহার মনে হইল ধর্ম্মের নামে মহা অধর্ম্ম করিতে হইবে, ন্যায়ের নামে মহা অন্যায় করিতে হইবে, জাতিরক্ষার নামে জাতিধ্বংস করিতে হইবে। জগতের এই কঠোর সত্য যখন মানুষের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—তখন মানুষ একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু জগতের এই কঠোরতা, এই নির্ম্মমতাই চরম সত্য নহে—ইহা অপেক্ষাও উপরের সত্য আছে, যেখানে জগতের সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়াছে, সকল বিরোধের সামঞ্জস্য হইয়াছে, সকল ধ্বংস, মৃত্যু অমৃতত্বে গিয়া পৌঁছিয়াছে। সেই চরম সত্যকে ধরিতে

পারিলেই সংসারের কোন অবস্থাতেই আর মানুষকে বিচলিত হইতে হয় না, মানুষ বুঝিতে পারে যে, সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায় অন্যায়, মিলন দ্বন্দ্ব, জীবনমৃত্যুর ভিতর দিয়া মানুষ পরম আনন্দের দিকে অগ্রসর হইতেছে, অমৃতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু সেই চরম সত্যকে পাইতে হইলে, সেই পরম আনন্দময় অবস্থা লাভ করিতে হইলে, জগৎটা বর্ত্তমানে কিরূপ তাহা আমাদিগকে সাহস করিয়া চাহিয়া দেখিতেই হইবে, জগতের সত্যকে কোমল মিথ্যার আবরণে ঢাকিয়া রাখিলে চলিবে না, জগৎকে দেখা আর ভগবানকে দেখা এক, কারণ জগৎ ভগবান ছাড়া নহে। তাই কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে জগতের ভীষণ রূপটা ভাল করিয়া দেখান হইয়াছে। স্বহস্তে স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করা, মহা ধ্বংসের অবতারণা করা, প্রচলিত ধ্যান, ধারণা, আদর্শকে পদদলিত করিয়া চলা, এই সবেরই প্রয়োজন হয় জগতেরই মঙ্গলের জন্য। ভগবানের বিশ্ব-রূপে অর্জ্জুন দেখিবেন এই যে কুরুক্ষেত্রের ভীষণ ধ্বংসকাণ্ড ইহা স্বয়ং ভগবানেরই রূপ। জগতে ধ্বংসের ভিতর দিয়াই সৃষ্টি হইতেছে, মৃত্যুর ভিতর দিয়াই জীবন হইতেছে, এবং এই ধ্বংসের কর্ত্তা, মৃত্যুর কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান ভিন্ন আর কেহই নহেন, কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো।

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥ ২৯

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ—হে কৃষ্ণ, যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ইমান্ স্বজনান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি, মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি, মে শরীরে বেপথুঃ চ রোমহর্ষঃ চ জায়তে, হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে, ত্বক্ চ এব পরিদহ্যতে।

অনুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ, এই সব আপনজনকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, মুখ শুকাইয়া যাইতেছে, শরীরে কম্প ও রোমহর্ষ উপস্থিত হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে, চর্ম্মও যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে।

ব্যাখ্যা

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্—অর্জ্জুনের বড় দুঃখ এই যে, তাঁহার অতি "আপনার" লোক সব প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছে। সংসারে লোক "আমার" "আমার" করে বলিয়াই যত কষ্ট পায়। "আমি" বলিতে লোকে এই শরীরটাকেই বুঝে এবং এই শরীরটার সহিত যাহাদের নিকট সম্বন্ধ তাহাদিগকেই "আপনার" জন মনে করে; কিন্তু ইহা মায়া, অজ্ঞান, অবিদ্যা, অহঙ্কার। আমাদের প্রকৃত "আমি" হইতেছে দেহ, মন, বুদ্ধির অতীত আত্মা। এই আত্মার সম্পর্কই অন্যান্য জীবের সহিত আমাদের প্রকৃত

সম্পর্ক। এই সম্পর্কে জগতের সকল মানুষ, সকল জীবই আমাদের "স্বজন", আমাদের আপনার লোক। এবং তাহাদেরও প্রকৃত সত্তা তাহাদের দেহ মন প্রাণ নহে, তাহাদেরও প্রকৃত সত্তা হইতেছে আত্মা। তাহাদের দেহ বিনষ্ট হইলে তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, আত্মার উন্নতি ও ক্রমবিকাশের জন্য দেহান্তরপ্রাপ্তিই মৃত্যু, অতএব কাহারও মৃত্যুতে শোক করিবার, দুঃখ করিবার কিছুই নাই। গীতায় অর্জ্জুনকে এই আত্মজ্ঞান দিয়াই তাহার শোক মোহ দূর করা হইয়াছে।

সীদন্তি মম গাত্রাণি—অর্জ্জুনের শরীরে তীব্র জ্বরের লক্ষণ উপস্থিত। তাঁহার চর্ম্ম যেন পুড়িয়া যাইতেছে, মুখ শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গে কম্প, রোমহর্ষ, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ আকুল, অবশ হাত হইতে গাণ্ডীবধনু খসিয়া পড়িতেছে। বিশ্ববিজয়ী বীর অর্জ্জুনের সহসা এ কি হইল! অন্তরে অতি গুরুতর আঘাত না লাগিলে সুস্থ শরীরে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় না।

অর্জ্জুনের প্রকৃতি যদি কর্ম্মপ্রবণ না হইয়া চিন্তাশীল হইত, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রের সন্ধি স্থলে দাঁড়াইয়া তাঁহার মনে যে সব সংশয় উদিত হইয়াছিল, কুরুক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বেই সে সব তাঁহার মনে উঠিত এবং সে বিষয়ে তখনই একটা মীমাংসা করিতে পারিতেন। কিন্তু অর্জ্জুনের মধ্যে কর্ম্মের প্রেরণাই খুব বেশী, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি স্থূল নীতি তিনি ঠিক করিয়া ধরিয়া রাখিয়া-

ছিলেন। দেশ রক্ষা করিতে হইবে, জাতি রক্ষা করিতে হইবে, অত্যাচারের অধর্ম্মের দমন করিতে হইবে, ন্যায় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ইত্যাদি। যখন এই সব উচ্চ ও মহান আদর্শ ও নীতি অনুসারে কোন কর্ম্ম তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইত, তিনি তাহাতে অতি উৎসাহের সহিত লাগিয়া পড়িতেন। যাঁহারা বলেন, গীতায় কেবল নিঃস্বার্থভাবে কর্ত্তব্য পালনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা গীতার ভুল অর্থ করেন। অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য করিতে উৎসাহ ও উপদেশ দিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না —উচ্চ আদর্শের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া অর্জ্জুন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, কোনটা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার সব ধ্যান ধারণা ওলট পালট হইয়া গেল, তিনি ধরিবার মত কোন ধর্ম্ম বা নীতি পাইলেন না, তাঁহার বিপুল উদ্যম ও কর্ম্মশক্তিকে লাগাইতে পারেন এমন কোন স্থির আদর্শ পাইলেন না। কর্ম্মীর পক্ষে এত বড় বিভ্রাট আর নাই। যতক্ষণ সে তাহার কর্ম্মশক্তিকে প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র পায়, ততক্ষণ তাহার আনন্দ ও উৎসাহের অবধি থাকে না, আদর্শের জন্য প্রাণ দিতেও তাহার অপার আনন্দ, সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্। এরূপ যুদ্ধের সুযোগ ও ক্ষেত্র যাহার মিলিয়াছে, সেই ক্ষত্রিয় পরম সৌভাগ্যবান। কুরুক্ষেত্রে আসিয়া অর্জ্জুন

নিজেকে এমনই সৌভাগ্যবান মনে করিতেছিলেন, তিনি বিপুল উৎসাহে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর, তাঁহার সমস্ত শরীর মন যুদ্ধের জন্য উদ্‌গ্রীব, কিন্তু সহসা সম্মুখে যাহা দেখিলেন তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপলব্ধি হইল যে, যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্যত ধনুর্ব্বাণ হস্তে অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইল, তাঁহার ইচ্ছাশক্তির জোর কমিয়া আসিল, সেই সুযোগে নীচের যে সব প্রবৃত্তি তিনি জোর করিয়া চাপিয়া রাখিয়াছিলেন সেগুলি বাঁধভাঙ্গা তরঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। রক্তপাত করিতে স্বাভাবিক শিহরণ, আত্মীয় স্বজনের প্রতি মায়া, কঠোর কর্ত্তব্য পালনের দুঃখ সহিতে অনিচ্ছা, এই সমস্ত তাঁহার দেহ মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডীব আপনিই খসিয়া পড়িল।

আমরা যতই বুদ্ধিমান, চরিত্রবান, কর্ত্তব্যপরায়ণ হই না কেন, যতক্ষণ আমরা কেবল আমাদের মানসিক বুদ্ধি ও মানসিক ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলি, ততক্ষণ আমাদের আত্মজয় সম্পূর্ণ হয় নাই, ততক্ষণ আমরা প্রকৃত মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই, যে কোন মুহূর্ত্তে, বিশেষতঃ জীবনের শ্রেষ্ঠ সন্ধিক্ষণে আমরা ভ্রম ও সংশয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে পারি, আমাদের সমস্ত সংযম হারাইয়া প্রতিকূল ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারি। আদর্শ ক্ষত্রিয় বীর, সংযমী, চরিত্রবান অর্জ্জুনের এই দারুণ দুর্দ্দশাই তাহার

প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই বিপদের সম্ভাবনা হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় আমাদের মানসিক বুদ্ধি ও ইচ্ছার উপরে যে দিব্য অতিমানসিক শক্তি (Supramental power বা বিজ্ঞান শক্তি) রহিয়াছে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করা এবং সেই শক্তির সাহায্যে আমাদের ভিতরের সমস্ত অপূর্ণতা ও অশুদ্ধিকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া দূর করিয়া, আমাদের এই নীচের মানবীয় প্রকৃতিকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, রূপান্তরিত (Transformed) করিয়া উচ্চতর ভাগবত প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, মানুষভাব ছাড়াইয়া দেবভাব লাভ করা। শ্রীকৃষ্ণ পরম সখা অর্জ্জুনকে সেই দিব্য অবস্থায় তুলিয়া লইতে চান, তাই নীচের জীবনের দুর্দ্দশা তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ। মানুষ সাধারণতঃ যে সহজাত সংস্কারের বশে, ইন্দ্রিয়ের প্রেরণার বশে, হৃদয়ের অশুদ্ধ আবেগের বশে চলিয়া থাকে, অর্জ্জুন সম্পূর্ণভাবে সে সকলের উপরে উঠিতে পারেন নাই, নিস্ত্রৈগুণ্যঃ হইতে পারেন নাই, তিনি কেবল উচ্চ আদর্শ এবং সাধারণ ভালমন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা সে সবকে সংযত করিয়া আসিয়াছেন, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজঃ ও তমঃকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছেন ; কিন্তু এখন তাঁহার সমস্ত সংযম দূর হইল, তিনি তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সাধারণতঃ হত্যাকাণ্ড করিতে, রক্তপাত করিতে আমাদের রক্তমাংসের

শরীর বিমুখ হয়, ভীষণ ধ্বংসকার্য্যের সম্মুখে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া আইসে, কর্ত্তব্যপরায়ণ বীর পুরুষেরা ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে এই বিমুখতা জয় করেন। এমন কি স্বার্থপর ব্যক্তিরাও রাজসিক তেজের দ্বারা স্নায়ুর এই দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া দেয়। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে হৃদয়ের অবসন্নতায় অর্জ্জুনের সে শক্তি, সে তেজ সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইয়াছে, তিনি অতি নীচ,কাপুরুষ,তামসিকভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। রক্তপাত করিতে ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক শিহরণের ফলে অর্জ্জুনের হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল, ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য যুদ্ধ হইতে তিনি পরাঙ্মুখ হইলেন, তাঁহার এই দীনতা ও দৌর্ব্বল্যের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অতি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ২।৩

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥

অন্বয়। হে কেশব, অবস্থাতুম্ চ ন শক্নোমি, মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব, বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি।

অনুবাদ। হে কেশব, আমি যে আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ঘুরিতেছে, আবার নানা অমঙ্গলসূচক লক্ষণও দেখিতে পাইতেছি।

ব্যাখ্যা।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং। দারুণ মর্ম্ম বেদনায় অর্জ্জুনের দেহ ও মন দুইই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

ভ্রমতীব চ মে মনঃ। পূর্ব্বে বাহ্যেন্দ্রিয়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এখন অন্তরিন্দ্রিয় মনের কি অবস্থা তাহাই বলা হইতেছে। মনই শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়, মনই চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলকে পরিচালিত করে। মন স্থির না থাকিলে আমাদের সমস্ত জীবন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, আমাদের দ্বারা কোন জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না, কোন কর্ম্মও সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। অর্জ্জুনের ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের আদর্শ গোলমাল হইয়া যাওয়ায় তাঁহার মন যেন লক্ষ্যহারা, পথহারা হইয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিল।

নিমিত্তানি। অর্জ্জুন চারিদিকে অশুভ লক্ষণসকল দেখিতে লাগিলেন। ইহা তাঁহার হৃদয়ের অবসন্নতারই পরিচায়ক। যখন আমাদের মনে সন্দেহ ও ভয়ের উদয় হয় তখন অমঙ্গলসূচক বিপরীত লক্ষণগুলিই আমাদের চোখে পড়ে। ভবিষ্যতে কখন কি অমঙ্গল আসিবে, বিপদ আসিবে, তাহার আশঙ্কা করিয়া বীরপুরুষ বর্ত্তমান কর্ত্তব্যের পথ হইতে এতটুকু বিচলিত হন না। তিনি অমঙ্গলসূচক লক্ষণ-সমূহকে গ্রাহ্যই করেন না, যখন অমঙ্গল বা বিঘ্ন বাস্তবিকই আসিয়া পড়ে তখন সাহসের সহিত তাহার সম্মুখীন হন।

এইরূপ সাহসের ফলে, দৃঢ়তার ফলে অনেক সময় আসন্ন বিপদও দূরে চলিয়া যায়। কিন্তু হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ নানা অশুভ লক্ষণ দেখিয়া যাহারা "বিপদ আসিবে, বিঘ্ন আসিবে" কেবলই এইরূপ আশঙ্কা করে তাহারা এইভাবে দূরের বিপদকেও নিকটে ডাকিয়া আনে। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুন যে চারিদিকে বিপদের লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, প্রকৃত বীরত্ব ও সাহস হইতে তিনি স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥

অন্বয়। আহবে স্বজনং হত্বা শ্রেয়শ্চ ন অনুপশ্যামি। হে কৃষ্ণ, বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে, ন চ রাজ্যং, ন চ সুখানি (কাঙ্ক্ষে)।

অনুবাদ। যুদ্ধে স্বজন হত্যা করিয়া আমি কোন শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ, আমি বিজয় চাহি না, রাজ্যও চাহি না, সুখও চাহি না।

ব্যাখ্যা।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি। অর্জ্জুন কর্ম্মী। কোন কর্ম্মটা করিলে ভাল হইবে, আত্মার কল্যাণ হইবে, জাতির কল্যাণ হইবে,—এই সম্বন্ধে যখন তাঁহার কোন সন্দেহ থাকে না

তখন তিনি বেশ নিশ্চিন্ত মনে কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে স্বজন হত্যা করিয়া কি ভাল হইবে, কি কল্যাণ হইবে, অর্জ্জুন তাহা দেখিতে পাইলেন না এবং এইটাই অর্জ্জুনের প্রধান সমস্যা। কর্ম্মী যতক্ষণ কর্ম্ম করিতে পায় ততক্ষণ বেশ থাকে, কিন্তু যখনই কর্ম্মের সূত্র হারাইয়া ফেলে, তখনই তাহার মুস্কিল। শুভের জন্য, মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম করাই অর্জ্জুনের ন্যায় সাত্ত্বিক কর্ম্মীর আদর্শ; অর্জ্জুন বর্ত্তমান যুদ্ধে শুভ বা মঙ্গল কিছু দেখিতে পাইলেন না।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং। সাধারণতঃ মানুষ কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করিয়া, বাসনা করিয়াই কর্ম্ম করে। গীতা দেখাইবে যে, এইরূপ বাসনার বশে কর্ম্ম করাই বন্ধনের মূল। নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যের পালনই গীতার শিক্ষা। অর্জ্জুন এখনও সে শিক্ষা পান নাই, তিনি জানেন যে, কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কর্ম্ম চলিতে পারে না। অবশ্য তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির, ধার্ম্মিক প্রকৃতির লোক। তাঁহার বাসনা নীচ পাপ বাসনা নহে। ধর্ম্মযুদ্ধে বিজয়লাভ, রাজ্যলাভ, সুখলাভ, এই সব বাসনার দ্বারাই অর্জ্জুনের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণ কর্ম্মে পরিচালিত হন। কিন্তু, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অর্জ্জুনের এসবে আর আকাঙ্ক্ষা নাই, স্বজনকে হত্যা করিয়া বিজয়, রাজ্য-সুখ তাঁহার বাঞ্ছনীয় মনে হইল না, অতএব তিনি কিসের জন্য কর্ম্ম করিবেন, কিসের জন্য এই মহাযুদ্ধ করিবেন? বিজয়, রাজ্য-সুখ এই সবই শ্রেয়ঃ বা কল্যাণ

বলিয়া লোকে আকাঙ্ক্ষা করে,—কিন্তু স্বজনকে হত্যা করিয়া এই সব লাভ করা শ্রেয়ঃ বলিয়া অর্জ্জুনের মনে হইল না।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২
তে ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪

অন্বয়। হে গোবিন্দ, নঃ রাজ্যেন কিং, ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিং, যেষাং অর্থে নঃ রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতম্, তে ইমে আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ তথা এব চ পিতামহাঃ মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ তথা সম্বন্ধিনঃ প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ। হে মধুসূদন, ঘ্নতোঽপি এতান্ হন্তুং ন ইচ্ছামি।

অনুবাদ। বল, গোবিন্দ, রাজ্যে আমাদের কি লাভ? কি প্রয়োজন ভোগে? জীবনেই বা কি প্রয়োজন? যাঁহাদের জন্য আমরা রাজ্য চাই, ভোগ সুখ চাই তাঁহারাই জীবন ও ধন পরিত্যাগ করিয়া এই মহাযুদ্ধে দণ্ডায়মান; আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র শ্যালক, কুটুম্ব।

হে মধুসূদন, ইহাদের দ্বারা নিহত হইতে হয় তাহাও স্বীকার ; তথাপি আমি ইহাদিগকে নিধন করিতে চাই না।

ব্যাখ্যা।

কিং নো রাজ্যেন। অর্জ্জুন এখন লাভালাভ বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনের ইন্দ্রিয় ও মনের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয় ও মনের উপরে বুদ্ধি—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্বুদ্ধের্যুঃ পরতস্তু সঃ। ৩।৪২

এই বুদ্ধির সাহায্যে আমরা লাভ লোকসান, ভাল, মন্দ, পাপ, পুণ্য বিচার করি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করি। আমাদের ইন্দ্রিয় ও মন যতক্ষণ বুদ্ধির অধীনে থাকে ততক্ষণই আমাদের জীবনে শৃঙ্খলা থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয় ও মন ক্ষুব্ধ হইয়া যখন বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে, তখন জীবন বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অর্জ্জুনের তাহাই হইয়াছে।

এই বুদ্ধির বিকাশ মানুষে হইয়াছে বলিয়াই মানুষ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব। যেমন বাহ্যিক শক্তির ঠেলায় চালিত হওয়া জড় পদার্থের ধর্ম্ম, যেমন ক্ষুৎপিপাসা, কাম, ক্রোধ, আত্মরক্ষা প্রভৃতি সহজাত সংস্কারের দ্বারা, instinct এর দ্বারা পরিচালিত হওয়া পশুর ধর্ম্ম, তেমনিই সম্যক

ভাবে বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া চলাই মনুষ্যের স্বধর্ম্ম। কিন্তু মানুষ এখনও সম্পূর্ণভাবে জড়ের ধর্ম্ম, পশুর ধর্ম্ম ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই, বরং সাধারণতঃ অধিকাংশ মনুষ্যেই জড় ও পশুর ধর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্যত্ব বড় অধিক দেখা যায় না, তাহাদের মধ্যে বুদ্ধির যতটুকু বিকাশ হইয়াছে তাহা তামসিক ও রাজসিক প্রবৃত্তির দ্বারাই আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাহাদের বুদ্ধি নীচের প্রবৃত্তিগুলিকেই অনুসরণ করে, তাহাদের কার্য্যই সমর্থন করে এবং এই জন্যই তাহারা ঊর্দ্ধ জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। কেবল যাহাদের মধ্যে সাত্ত্বিকতার সমধিক বিকাশ হইয়াছে,তাহারাই উচ্চভাব, উচ্চ-আদর্শ, উচ্চ-জ্ঞানের দ্বারা নীচের প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়মিত ও সংযত করিয়া ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে থাকে। অর্জ্জুন এইরূপই উচ্চশ্রেণীর সত্ত্ব-রাজসিক মানুষ ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তামসিকতা তাঁহার সমস্ত অন্তঃকরণকে অধিকার করিযা বসিল, তাঁহার বুদ্ধিও তামসিকতার কবলে পড়িয়া তাঁহার কর্ত্তব্য-বিমুখতাকেই নানা ছাঁদে সমর্থন করিতে আরম্ভ করিল। বাস্তবিক আমাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের বিকাশ যতই হউক, আমরা যতই চরিত্রবান, জ্ঞানবান, ন্যায়-পরায়ণ হই না কেন, যতক্ষণ আমরা সমস্ত গুণকে জয় করিয়া সমস্ত গুণের উপরে, প্রকৃতির খেলার উপরে উঠিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ আমালের আত্মজয় সম্পূর্ণ হয় নাই ; যে কোন মূহূর্ত্তে নীচের

তামসিকতা ও রাজসিকতা আমাদের সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া আমাদিগকে নীচের দিকে টানিয়া লইতে পারে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রথমেই বলিয়াছিলেন, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন, "অর্জ্জুন, তুমি গুণত্রয়ের খেলা ছাড়াইয়া উপরে উঠ"।

অর্জ্জুন বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হন নাই, বরং তিনি এই মহাযুদ্ধকে পরম ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বুঝিয়াই উৎসাহের সহিত যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সহসা নীচের প্রবৃত্তিসমূহের উচ্ছলতায় যখন তাঁহার সমস্ত শরীর অবসন্ন হইল, গাণ্ডীব হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল, তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করা শারীরিক (physically) অসম্ভব হইয়া পড়িল, তখন তিনি তাঁহার এই তামসিকতাকে সমর্থন করিবার জন্যই নানারূপ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতে লাগিলেন। মানুষ বুদ্ধি-জীবী, নিজের বুদ্ধিকে তৃপ্ত করিতে না পারিলে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, তাই মানুষ যখন নিতান্ত অসৎ ও অন্যায় কার্য্যও করিতে অগ্রসর হয়, তখনও কোন রকমে তাহার মনকে বুঝাইয়া রাজি করিয়া লয়। এখানে অর্জ্জুন তাঁহার যুদ্ধরূপ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত। তাই তিনি বিচার করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, এই যুদ্ধ করিয়া কোন লাভ, কোন কল্যাণই হইতে পারে না, ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি। যুদ্ধ করিব কিসের আশায়? রাজ্য, ভোগ,

সুখ? কিন্তু যাহাদিগকে লইয়া এই সব উপভোগ করিতে হয়, যাহাদের জন্যই এই সব বাঞ্ছনীয়, তাহারাই সকলে জীবন ও ধনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে উপস্থিত, তাহা হইলে যুদ্ধ করিয়া লাভ কি? সামান্য পৃথিবীর রাজ্য, পৃথিবীর ভোগ-সুখ ত' দূরের কথা, ত্রিভুবনের রাজ্য পাইলেও এই সব আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করিয়া কোনও সুখ বা আনন্দ লাভ হইতে পারে না। অতএব যুদ্ধ করিয়া আমি কোনও শ্রেয়ঃ বা কল্যাণ দেখিতেছি না।

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং। স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া যুদ্ধের যে অন্য কোন প্রেরণা থাকিতে পারে অর্জ্জুনের সে ধারণা নাই। অর্জ্জুন উন্নত চরিত্রের মানব হইলেও স্বার্থপর ছিলেন, তবে অপরের তুলনায় তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, তাঁহার স্বার্থ ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ নহে, তিনি কেবল নিজের ভোগ-সুখই খোঁজেন না, তিনি চান আত্মীয় স্বজনের কল্যাণ, স্বজাতির কল্যাণ, স্বদেশের কল্যাণ। কিন্তু তাঁহার এই স্বার্থ উদার ও মহৎ হইলেও তাহা স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে, কেবল এখানে "স্ব"কে, "অহং"কে বড় করিয়া, বিস্তৃত করিয়া দেখা হইয়াছে। স্বার্থের উপর নির্ভর করিয়া আমরা বেশী দূর যাইতে পারি না, স্বার্থ যতই উদার ও মহৎ হউক তাহা অহঙ্কারের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, অতএব তাহা আমাদের বন্ধনের কারণ হয়, অসুখের কারণ হয়, স্বার্থের বশে কাজ করিয়া চলিলে আমাদের কর্ত্তব্য সম্যকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না,

সঙ্গীন মুহূর্ত্তে আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সব নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি। অর্জ্জুনের এই দুর্দ্দশাই হইয়াছিল, তাই ভগবান স্বার্থের বশে কাজ করিবার পরিবর্ত্তে, যজ্ঞার্থে কাজ করিবার উপদেশ অর্জ্জুনকে দিয়াছেন, তাহা আমরা পরে দেখিব,

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৩।৯

কোনও স্বার্থ সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা, ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হিসাবে সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহাই গীতার শিক্ষা।

অর্জ্জুনের এখানে মনোভাব এইরূপ, এই যে আমরা ন্যায়ের জন্য, ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি, বাস্তবিকপক্ষে দেখিলে ইহা কি আত্মীয় স্বজনের স্বার্থের জন্য, রাজ্য ভোগ সুখের জন্যই নহে? কিন্তু সেই আত্মীয় স্বজনেরই ধনপ্রাণ বিনষ্ট করিয়া যদি এই রাজ্যভোগ পাইতে হয় তাহা হইলে সে রাজ্যভোগের প্রয়োজন কি?

প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ। অর্জ্জুন এখানে কঠোর ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। ঐ ধর্ম্ম তাঁহার কাছে কেমন বিসদৃশ ঠেকিতেছে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কি? ক্ষত্রিয় শুধু বাঁচিয়া থাকিতে চায় না, শুধু ধনসম্পদবিলাসে ডুবিয়া থাকিতে চায় না, ক্ষত্রিয় চায় যশঃ, গৌরব, বিজয়। যুদ্ধে জয় লাভ করায় যে সুখ আছে, যে গৌরব আছে

তাহার জন্য ক্ষত্রিয় সকল সময়েই প্রাণ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, ত্যক্তজীবিতাঃ। তামসিকতা ও দৌর্ব্বল্যের বশে অর্জ্জুন এখন এই মহান্ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের কোন অর্থ খুজিয়া পাইলেন না। জীবনের সুখ ভোগের জন্যই ধন, সম্পদ, বিজয় এই সব প্রয়োজনীয় কিন্তু যদি মৃত্যুই হইল তাহা হইলে সুখ ভোগ কে করিবে? কিন্তু এই যুক্তি কাপুরুষোচিত, অনার্য্যজুষ্টম্, ক্ষত্রিয়বীর অর্জ্জুনের মুখে এরূপ যুক্তি শোভা পায় না। ক্ষত্রিয় কখনও মৃত্যুর সম্মুখে এত কাতর হয় না। তাহার নিকট অযশ, অগৌরব মৃত্যু অপেক্ষাও বেশী, মরণাদতিরিচ্যতে। শ্রীকৃষ্ণ পরে এই ক্ষত্রিয়োচিত যুক্তি অর্জ্জুনকে শুনাইবেন, কিন্তু আমরা দেখিব অর্জ্জুনের অবসাদ তাহাতেও দূর হইবে না।

ঘ্নতোঽপি। অর্জ্জুনের নিকট জীবনই বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছে, তিনি আর বাঁচিতেই চান না। অর্জ্জুন ভাবিতেছেন এখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যদি আসিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে ত' ভাল হয়, তাহার এই নিদারুণ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার অবসান হয়। অন্য সময়ে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি না হউক, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য সামান্য কীটপতঙ্গও শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া থাকে। অর্জ্জুনের সে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকে উহারা মারিয়া ফেলিলেও তিনি আর যুদ্ধ করিতে চান না। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয় সেও ভাল, তথাপি তাহাদিগকে বধ করিয়া তিনি শূন্য দুঃখময় জীবন বহন করিতে চান না।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫

অন্বয়। হে জনার্দ্দন, মহীকৃতে কিং নু? ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য হেতোঃ অপি ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ?

অনুবাদ। পৃথিবীর রাজ্য কোন ছার, ত্রিভুবনের রাজ্যের জন্যও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বিনাশ করিয়া আমাদের কি আনন্দ হইবে, জনার্দ্দন?

ব্যাখ্যা

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য। স্বজন-বধের আশঙ্কায় অর্জ্জুনের ভিতরে যে শোকদুঃখের উদয় হইয়াছে তাহাতে তাঁহার প্রাণ, মন এমন কি ইন্দ্রিয়গণ পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ যে সব ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সুখ ভোগ করিবে তাহারাই যদি বিমুখ হয়, তাহা হইলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত ভোগ সুখের সামগ্রী আছে তাহা পাইলেও কি লাভ হইবে?

কা প্রীতিঃ। ক্ষত্রিয় বীর যুদ্ধ ও শত্রুবধ করিতে উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হয়, কারণ এই কার্য্যে সে আনন্দ পায়। কিন্তু স্বজনের শোকে অর্জ্জুনের সে আনন্দ লোপ পাইয়াছে, তাই আর যুদ্ধ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই।

অর্জ্জুন যত কথা বলিতেছেন, তাহার মূলে রহিয়াছে স্বার্থ, অহংজ্ঞান, তাঁহার নিজের শরীর অবসন্ন হইতেছে, তিনি যুদ্ধে

কোন লাভ দেখিতেছেন না, তাঁহার হৃদয় স্বজন শোকে হাহাকার করিতেছে। কিন্তু উচ্চপ্রকৃতির মানব এইরূপ নিজের সুখ দুঃখ, লাভালাভের দিকে তাকাইয়া সংসারের কাজ করেন না, তিনি শুধু দেখেন তাঁহার কর্ত্তব্য কি, তাঁহাকে করিতে হইবে কি, ভগবান তাঁহার নিকট হইতে কি কাজ চান, তাঁহার উপর কোন উদ্দেশ্য সাধনের ভার দিয়াছেন এবং ইহা বুঝিয়া লইয়া তিনি অবিকম্পিত হৃদয়ে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত সেই কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হন। তিনি ভগবানের ইচ্ছার অনুসরণ করিতেছেন, জগতে ভগবানের কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করিতেছেন, এই দিব্য আনন্দেই তাঁহার হৃদয় মন পরিপূর্ণ থাকে। অর্জ্জুন দুর্ব্বলতার বশে এই উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছেন।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬

অন্বয়। এতান্ আততায়িনঃ হত্বা অস্মান্ পাপম্ এব আশ্রয়েৎ। তস্মাৎ বয়ং স্ববান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ, হে মাধব, হি স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম।

অনুবাদ। এই সকল আততায়িগণকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপগ্রস্তই হইতে হইবে। অতএব সবান্ধব দুর্য্যোধনকে বধ করা আমাদের পক্ষে উচিত হয় না। হে

মাধব, স্বজন বধ করিয়া আমরা সুখীই বা কেমন করিয়া হইব ?

ব্যাখ্যা

পাপমেবাশ্রয়েৎ। এইবার অর্জ্জুনের ধর্ম্মবুদ্ধি জাগিয়া উঠিয়াছে। লাভ লোকসানের কথা, নিজের সুখদুঃখের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে, কারণ ইহা পাপ। রক্তপাত করা, জীব হিংসা করাই পাপ, তাহার উপর রাজ্যলোভে আত্মীয় স্বজনকে বধ করা মহাপাপ। অর্জ্জুনের এই যে ধর্ম্মজ্ঞান, ইহা এখানে তাঁহার তামসিকতাকে, তাঁহার দেহ, মন, প্রাণের বিদ্রোহকেই সমর্থন করিল। আমাদের ভিতরে যে পাপ পুণ্যের বোধ জাগিয়া উঠে তাহা সকল সময়েই ঠিক পথ দেখাইতে পারে না; নীচের প্রকৃতির মোহ ও অশুদ্ধ প্রেরণার বশে এই ধর্ম্মবুদ্ধি অনেক সময় কলুষিত ও বিপর্য্যস্ত হয়। অতএব সাধারণ মানবের পক্ষে পাপ পুণ্য বোধ ও ধর্ম্মজ্ঞান পরম সহায় হইলেও উহা আমাদিগকে বেশী দূর লইয়া যাইতে পারে না; ঊর্দ্ধে দিব্য জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদিগকে আমাদের অশুদ্ধ মনের গতানুগতিক পাপ পুণ্য বোধেরও উপরে উঠিতে হইবে; কেবল মাত্র ভগবানের নির্দ্দেশকেই লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। এইরূপে ভগবানে পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে কোন পাপই আমাদিগকে স্পর্শ

করিতে পারিবে না। অর্জ্জুন পাপের ভয়ে ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম হইতে বিরত হইতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ গীতার শিক্ষা দিয়া তাঁহার সেই ভয় ও সংশয় দূর করিয়া দিলেন। সেই শিক্ষার সর্ব্বগুহ্যতম কথা হইতেছে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥১৮।৬৬

হত্বৈতানাততায়িনঃ। এই সকল আক্রমণকারীকে বধ করিলে পাপ হইবে, ইহাই অর্জ্জুনের বক্তব্য। জীবহিংসা সকল অবস্থাতেই পাপ, কেহ আক্রমণ বা অত্যাচার করিতে আসিলেও তাহাকে হত্যা করা উচিত নহে, এই যে অহিংসার নীতি, অর্জ্জুন এখানে তাহারই সমর্থন করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। নীতির বিচারে যে এইরূপ মনোভাবকে খুবই সমর্থন করা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান যুগে রুশদেশীয় মনীষী টলষ্টয় Tolstoy এবং তাঁহার শিষ্য মহাত্মা গান্ধী এই নীতির প্রবর্ত্তক। কিন্তু যে মনোভাবের বশে উচ্চপ্রাণ মানব দেশের ও সমাজের হিতের জন্য সশস্ত্র অত্যাচারীর সম্মুখীন হয় এবং তাহাকে বধ করিয়াও তাহার অত্যাচার নিবারণ করে, নীতির বিচারে সেই মনোভাবকেও ঠিক সমান ভাবেই সমর্থন করা যায়। অহিংসানীতির অবলম্বন করিয়া আমরা জগতে শান্তি স্থাপনে যতটা সহায়তা করিতে পারি, ধর্ম্ম-যুদ্ধ করিয়া অনেক সময়ে তাহা অপেক্ষা অধিক সহায়তা করা যায়। অতএব নীতির বিচারে অহিংসা ও যুদ্ধ

উভয়কেই সমানভাবে সমর্থন করা যাইতে পারে। এরূপ বিচারের দ্বারা কখনও চরম মীমাংসা হইতে পারে না, যাহার যেমন স্বভাব, যেমন মতিগতি, যেমন শিক্ষাদীক্ষা তিনি তেমনিই মত গ্রহণ করিবেন। অর্জ্জুন কিন্তু এখানে মোহের বশে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে, নিজের স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধে মত পোষণ করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার নৈতিক অধঃপতনই সূচিত হইতেছে।

হিংসা ও অহিংসার আদর্শের চরম মীমাংসা শ্রীকৃষ্ণ গীতায় করিয়া দিয়াছেন, ফলাফলের দিকে না তাকাইয়া কর্ত্তব্য হিসাবে অনাসক্তভাবে যাহাই কর না কেন তাহাতে কোন পাপ হইতে পারে না—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ২।৩৮

স্বজনং হি কথং হত্বা। পাপ পুণ্যের বিচার করিতে করিতে আবার অর্জ্জুনের হৃদয় শোকে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল. স্ব-জন, "নিজের লোক", তাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা কেমন করিয়া সুখী হইব, মাধব? অর্জ্জুনের মস্তিষ্কে বিষম গোলমাল উপস্থিত, তাঁহার বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত, তিনি কার্পণ্য-দোষাপহতস্বভাবঃ, তিনি পরিষ্কারভাবে কোন চিন্তা করিতে পারিতেছেন না, তাই কখনও লাভ লোকসানের কথা বলিতে-ছেন, কখনও পাপপুণ্যের কথা তুলিতেছেন, আবার ভিতর

হইতে শোকে প্রাণ অস্থির হওয়ায় হাহাকার করিয়া উঠিতেছেন।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮

অন্বয়। যদ্যপি এতে লোভোপহতচেতসঃ কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে পাতকং চ ন পশ্যন্তি, হে জনার্দ্দন, কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুম্ কথং ন জ্ঞেয়ম্?

অনুবাদ। যদিও ইহারা লোভে হতবুদ্ধি হইয়া কুলক্ষয়ের দোষ ও মিত্রদ্রোহের পাপ দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু জনার্দ্দন, আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, কেন আমাদের জ্ঞান হইবে না? এই পাপ হইতে আমরা কেন নিবৃত্ত হইব না?

ব্যাখ্যা

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি। দুর্য্যোধনাদির লোভ স্বার্থপরতা হইতেই এই যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছে, তাহারাই আততায়ী, অত্যাচারী ইহা সত্য, তথাপি এ ক্ষেত্রে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করা আমাদের পক্ষে পাপ হইবে। কারণ

তাহারা লোভে অন্ধ, নিজেদের ভাল্‌মন্দ বুঝিতে না পারিয়া নিজেদেরই সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কুলক্ষয়ের ভীষণ দোষ, জ্ঞাতি হত্যার মহাপাপ দুর্য্যোধনাদি অজ্ঞানের বশে দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু এই দোষ, এই পাপ সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়া, জানিয়া শুনিয়া সজ্ঞানে যদি আমরা এই ঘোর অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে মহাপাপ হইবে।

মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্‌। যাহারা স্বভাবতঃ অনুকূল ও ও সহায় তাহারাই মিত্র। লাভালাভের কথা, কুলক্ষয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও যাহারা স্বভাবতঃ আমাদের হিতকামী, সহায়, বন্ধু তাহাদের অনিষ্টাচরণ করা মহাপাপ। অর্জ্জুন বলিতেছেন, এই গৃহ বিবাদে ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে, কুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, ইহজীবনের সুখশান্তি চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইবে, আবার মিত্রদ্রোহ পাপের ফলে পরকালে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্‌। এই যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম হিসাবে অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অন্তর বলিতেছে যে, এটা মহাপাপ। যে কর্ত্তব্যটা পাপ বলিয়া মনে হইতেছে সেটা তিনি কেমন করিয়া করিবেন? বাস্তবিকই অর্জ্জুনের এ যুক্তির কোন দোষ দেওয়া যায় না। কর্ত্তব্য যত বড়ই হউক না কেন, যদি বোধ হয় যে সেটা পাপ, তাহা কখনও করা উচিত নহে। গীতা কখনও পাপ করিতে

উপদেশ দেয় নাই, বরং গীতা অতি স্পষ্টই বলিয়াছে যে, যাহারা পাপাচরণ করে তাহারা ভগবানকে লাভ করিতে পারে না।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

মানুষ যদি পাপপুণ্যের বোধকে অগ্রাহ্য করিয়া চলে তবে তাহার আত্মার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সাধারণ জীবনে এই ধর্ম্মবুদ্ধিকে অনুসরণ করিয়াই মানুষ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে। গীতা অর্জ্জুনকে পাপ করিতে উপদেশ দেয় নাই, অথবা ভিতরের পাপপুণ্যবোধকে পদদলিত করিতেও বলে নাই। কিন্তু সাধারণ জীবনের উপরে আত্মার এমন অবস্থা আছে, যেখানে পাপপুণ্যে তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, ভগবান অর্জ্জুনকে সেই উর্দ্ধের জীবনলাভ করিবারই পরামর্শ দিয়াছেন।

গত ইউরোপীয় যুদ্ধে ইংরাজের অধীনে কয়েকজন পাঠান সৈন্য তুর্কির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল। সৈনিক হিসাবে তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল সেনাপতি যাহার বিরুদ্ধে আদেশ দিবেন তাহার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা। কিন্তু ঐ পাঠান সৈন্যগণের বোধ হইয়াছিল যে, মুসলমান হইয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে, খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মহাপাপ। সেনাপতির আদেশ অমান্য করায় ঐ পাঠান সৈনিকগণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল এবং তাহারা অবিচলিত ভাবে

সেই মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিল। গীতা কখনই ঐ পাঠান সৈনিকগণকে পাপের বোধ পদদলিত করিয়া অবিচলিত ভাবে সৈনিকের কর্ত্তব্য পালন করিতে উপদেশ দিত না। গীতার শিক্ষা সেইরূপ হইলে জগতের রাজনীতি ও কূটনীতি শাস্ত্রসমূহের মধ্যেই গীতার স্থান হইত, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের তালিকা হইতে গীতাকে বাদ দিতে হইত। কেবল নিঃস্বার্থ-ভাবে সামাজিক কর্ত্তব্য পালন গীতার শিক্ষা নহে। সাধারণ জীবনে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, পাপ পুণ্য, ভাল মন্দের যে দ্বন্দ্ব বিরোধ, কোন শাস্ত্র, কোন নীতির দ্বারা তাহার পূর্ণ মীমাংসা, চরম সামঞ্জস্য করা যায় না। গীতা বলিয়াছে, কর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা অতিশয় কঠিন, গহনা কর্ম্মণো গতিঃ, কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। যে আদর্শ ও নীতি অনুসারেই মানুষ কর্ম্ম করুক না কেন তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইতে পারে না,

সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।

তাহা হইলে গীতার সমাধান কি? গীতার শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম কি? গীতার মূল শিক্ষা হইতেছে, মানুষের ধর্ম্ম, মানুষের আদর্শ ও নীতি ছাড়াইয়া উঠিয়া দেবজীবন লাভ করা, দিব্য ভাবে কর্ম্ম করা, দিব্য কর্ম্মী হওয়া। মানুষভাব ছাড়াইয়া দেবভাবে উঠিবার, দিব্য কর্ম্মী হইবার সাধনায় তিনটী স্তর, তিনটী ধাপ গীতা দেখাইয়া দিয়াছে। প্রথম ধাপে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া, লাভালাভ, জয়পরাজয়

সমান জ্ঞান করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হিসাবে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহাই উপরে উঠিবার আরম্ভ, ইহাই গীতার কর্ম্মযোগ, এই স্তরেরই শিক্ষা হইতেছে—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ২।৪৭

দ্বিতীয় স্তরে শুধু ফলে অধিকার নহে, কর্ম্মে অধিকারও ত্যাগ করিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আত্মা সকল অবস্থায় অচল, অক্ষর, নিষ্ক্রিয়, সংসারে যাহা কিছু কার্য্য হইতেছে সে সব প্রকৃতির ক্রিয়া।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৩।২৭

মানুষ মনে করে, সেই বুঝি সব করিতেছে। কিন্তু উহা অজ্ঞান, অহঙ্কার, বাস্তবিক পক্ষে আত্মা, পুরুষ কিছুই করে না; পুরুষ উদাসীন, দ্রষ্টা মাত্র, প্রকৃতির গুণের দ্বারাই যাবতীয় কর্ম্ম চলিতেছে। এই জ্ঞান লাভ করিয়া অহংকার হইতে মুক্ত হইতে হইবে, ইহাই জ্ঞানযোগ। এই স্তরেও ঈশ্বরার্থে সমস্ত প্রকার কর্ম্ম চলিতে থাকে, কিন্তু কর্ম্মীর আর অহঙ্কার থাকে না, প্রকৃতিই তাহার ভিতর দিয়া ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে জীবনলীলার বিকাশ করিতেছে এই উপলব্ধি হয়।

তৃতীয় স্তরে উপলব্ধি হয় যে, এই প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে, প্রকৃতি পুরুষোত্তম ভগবানেরই প্রকৃতি, তাঁহার দ্বারাই

চালিত এবং জীব সেই পুরুষোত্তমেরই অংশ। পুরুষোত্তমে ভক্তি, প্রেম, কর্ম্ম অর্পণ করিতে হইবে, সম্পূর্ণভাবে তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে, তখন মানুষ পুরুষোত্তমের ভাব লাভ করিবে, পুরুষোত্তম যেমন মুক্ত, স্বাধীন ভাবে নিজ প্রকৃতিকে ধরিয়া দিব্যলীলা করিতেছেন, মানুষও পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হইয়া, পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করিয়া পুরুষোত্তমেরই সখারূপে মুক্ত স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম করিবে এবং তাঁহার দিব্য সংসার-লীলার আস্বাদ গ্রহণ করিবে। ইহাই ভক্তিযোগ। গীতা শিক্ষার ইহাই চরম রহস্য—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

১৮।৬৫, ৬৬

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥৩৯

অন্বয়। কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি, ধর্ম্মে নষ্টে অধর্ম্মঃ কৃৎস্নং উত কুলম্ অভিভবতি।

অনুবাদ। কুল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সনাতন কুলধর্ম্মসকল বিনষ্ট হয়, ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে অধর্ম্ম সমস্ত কুলকে অভিভূত করে।

ব্যাখ্যা

কুলক্ষয়ে। ইতঃপূর্ব্বে অর্জ্জুন স্বজন হত্যা, আত্মীয় হত্যা যে দোষের তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু আপত্তি উঠিতে পারে যে, ব্যক্তি অপেক্ষা কুল বড়, কুল রক্ষার জন্য কুলের অন্তর্গত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। ব্যক্তির প্রাণ দিয়াও যদি পরিবার রক্ষা করা হয়, কুলরক্ষা হয়, তবে তাহা বাঞ্ছনীয়। প্রাচীন ভারতবাসী কুলের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিত্বকে বলিদান দিতে কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু অর্জ্জুন দেখাইতেছেন যে, অতিরিক্ত লোকক্ষয় হইলে কুলের আর থাকিবে কি? কেবল কতকগুলি শিশু ও স্ত্রীলোক লইয়াই আর কুল রক্ষা হয় না। কুলের সব বীরপুরুষেরাই যদি নিহত হন তাহা হইলে কে কুলের ধর্ম্মকে রক্ষা করিবে? ধর্ম্মই কুলকে ধরিয়া রাখে। উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে যদি কুলের ধর্ম্ম, কুলের আদর্শ নষ্ট হয়, তাহা হইলে অধর্ম্ম বাড়িয়া উঠিয়া কুলকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে এবং তাহাতে সমস্ত কুল নষ্ট হইবে।

কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ। প্রাচীন ভারতে কুলের উপরেই ছিল সমাজের প্রতিষ্ঠা। কুল অর্থাৎ Clan, family, এক পূর্ব্বপুরুষের বংশধরগণকে লইয়া একটি কুল হইত, যেমন কুরুর বংশধরগণ কুরুকুল। এই কুরুকুলের মধ্যে পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ছিল একই পরিবারভুক্ত। প্রত্যেক কুলের ছিল বিশিষ্ট জীবনের ধারা। তাহারই অনুসরণ করিয়া

প্রত্যেক কুল স্বতন্ত্র ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিত। কুলের প্রকৃতিগত, বংশগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশ সাধনের নিমিত্ত যে সকল নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক রীতি নীতি উপযোগী বলিয়া উপলব্ধি হইত তাহাই হইত কুলের ধর্ম্ম। এই সকল রীতি নীতি কেবল মনগড়া আইন কানুন ছিল না, অথবা বাহির হইতে কোন বিজাতীয় শক্তি এই আইন কানুন বাঁধিয়া দিত না,—কুলের জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্মও ভিতর হইতে বিকশিত হইয়া উঠিত, এই জন্যই অর্জ্জুন এখানে বলিয়াছেন, এই সকল কুলধর্ম্ম সনাতন। এইরূপে বিভিন্ন স্বতন্ত্র কুল হইয়া উঠিত বিপুল জীবনীশক্তির আধার; জ্ঞানে, বীর্য্যে, সৌন্দর্য্যে স্বাধীন ভাবে গড়িয়া উঠিয়া তাহারা অপূর্ব্ব সম্পদের অধিকারী হইত। এই সকল বিভিন্ন কুলের মধ্যে যাহাতে বিরোধ না হয়, এক কুল আর এক কুলের উপর অন্যায় ভাবে অত্যাচার না করে, সকলেই আপন আপন স্বাধীন, স্বতন্ত্র জীবন-বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পায় এবং পরস্পরের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ে দেশের বিচিত্র ঐশ্বর্য্যময় জীবন ফুটিয়া উঠে, তাহাই ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রনীতির মহান্ আদর্শ। সকল কুলের মধ্যে এইরূপ সামঞ্জস্য সাধনের জন্য সকলের উপরে আধিপত্য করিতে পারে এমন রাজচক্রবর্ত্তীর প্রয়োজন ছিল। বিভিন্ন কুলকে জয় করিয়া, তাহাদিগকে পরাধীনতার পাশে বদ্ধ করিয়া, তাহাদের স্বাধীন জীবনকে নষ্ট করিয়া দিয়া, তাহাদের

ধন সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ ভারতে কখনও পূজিত হয় নাই। ধর্ম্মরাজ্যই ছিল ভারতের চিরন্তন আদর্শ; রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন ধর্ম্মের রক্ষক, ধর্ম্মাবতার; রাজা সকল কুলকে, সকল গ্রাম, নগর, জনপদকে আপন আপন ধর্ম্ম অনুসারে স্বাধীনভাবে চলিতে সাহায্য করিবেন—ইহাই ছিল ভারতীয় সাম্রাজ্যের আদর্শ। সমগ্র ভারতে এইরূপ একচ্ছত্র ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল।

বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে যে রাষ্ট্রশাসনের আদর্শ আমাদের দেশে আমদানী করা হইয়াছে ও হইতেছে তাহা ভারতের এই চিরন্তন আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই তাহা ভারত-বাসীর জীবনের সহিত কিছুতেই খাপ খাইতেছে না। এই বিদেশী আদর্শ অনুসারে এক কেন্দ্রশক্তি (গবর্ণমেণ্ট) নিজেদের গড়া আইন কানুন নীতি-ধর্ম্ম সমস্ত দেশের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিতে চায়, সকল বিষয়ে সকলকে এক ভাবে, এক ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে চায়। ইহাতে জাতীয় জীবনের সুচারু বিকাশ কখনই হইতে পারে না। এইরূপ ব্যবস্থায় একটা সাময়িক সামঞ্জস্য (harmony), একটা বাহ্যিক দক্ষতা (efficiency) হইতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে জাতির জীবনকে চাপিয়া পিষিয়া ক্ষুন্ন করিয়া দেওয়া হয়। ভারতে এরূপ কৃত্রিম সাম্রাজ্যগঠনের চেষ্টা পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এবং ভবিষ্যতে কখনও তাহা কৃতকার্য্য

হইবে না, কারণ ইহা ভারতের মজ্জাগত স্বাধীনতার বিরোধী।

কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তীযুগে ভারতে যে রাষ্ট্রজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা আর কেবল কুলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কুল ভাঙ্গিয়া দেশের নানা দিকে নানা রকমের স্বাধীন জীবন-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু, ভারতের জাতীয় জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য তাহাতে পূর্ণভাবেই বজায় ছিল, কেবল তাহার বৈচিত্র্যময় বিকাশ হইয়াছিল। সেই মূলনীতি হইতেছে, বিবিধ সজ্ঘ ও কেন্দ্র আপন আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বধর্ম্ম অনুসারে স্বাধীন ভাবে জীবনবিকাশ করিবে। বিভিন্ন গ্রাম, বিভিন্ন নগর, জনপদ, বিভিন্ন গণ, জাতি, ধর্ম্মসম্প্রদায়, বিভিন্ন স্বতন্ত্র সজ্ঘরূপে পরিণত হইয়া বিভিন্ন ভাবে আপন আপন প্রয়োজন বৈশিষ্ট্য ও শক্তি অনুসারে, আপন আপন স্বভাব ও স্বধর্ম্ম অনুসারে আপন আপন জীবন গড়িয়া তুলিত। প্রত্যেক গ্রামের লোক নিজেদের আবশ্যক অনুযায়ী আইন কানুন রীতি নীতি নির্দ্ধারণ করিত, নিজেদের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করিত, শিক্ষা, দীক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প. ব্যবসা প্রভৃতি সংসারের সকল বিষয়ে নিজেদের অভাব অভিযোগ দূর করিবার ব্যবস্থা করিত, নিজেদের জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও বিকাশের পথ খুঁজিয়া বাহির করিত এবং এই সকল নিজেরাই ঠিক করিত নিজেদের বিশিষ্ট অবস্থা, বিশিষ্ট স্বভাব ও শক্তির হিসাব লইয়া এবং এইরূপেই

তাহাদের মধ্যে বিচিত্র জীবনের বিকাশ হইত, বাহির হইতে কৃত্রিম আইন কানুনের, জোর জবরদস্তির চাপে তাহা ম্রিয়মান হইয়া উঠিত না।

যেমন গ্রামসঙ্ঘ, নগরসঙ্ঘ, জনপদসঙ্ঘ, তেমনই জাতি, ধর্ম্ম,বাণিজ্য, শিল্প বিষয়ক ছোট বড় নানা প্রকার সঙ্ঘ, নানা-মুখী জীবন লইয়া গড়িয়া উঠিত, সমস্ত দেশের সমস্ত জাতির মধ্যে অপূর্ব্ব জীবনের স্রোত প্রবাহিত হইত। সেই জীবনী শক্তির প্রভাবে দেশবাসীর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই সাধিত হইত। দেশের রাজশক্তি বা গবর্ণমেণ্ট এই সকল সঙ্ঘের বিশিষ্ট জীবন ও ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া, তাহাদের ভিতরকার ব্যাপারে বাহির হইতে কোন চাপ না দিয়া, বাহিরের জীবনে সকলের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিত। পরস্পরের সহিত বিরোধ ও সংঘর্ষ হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিত, বাহিরের ও ভিতরের শত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিয়া সঙ্ঘকে নিশ্চিন্ত ভাবে স্ব স্ব জীবন বিকাশের পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিত। ভারতের পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়,রাজাগণকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন তাঁহারা এই সকল বিভিন্ন সঙ্ঘের নিজস্ব রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, এক কথায় এই সকল সঙ্ঘের বিশিষ্ট ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন এবং দেশের সাধারণ শাসনকার্য্যে ইহাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। রাজাদের যে মন্ত্রণাপরিষদ ছিল,

৭

তাহার সভ্যগণ এই সকল বিভিন্ন সঙ্ঘ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইত।

ইহাই ভারতের রাষ্ট্রনীতির সনাতন জাতীয় আদর্শ। বিদেশী শাসনের অত্যাচারে ভারতের সেই সকল স্বাধীন জীবন-কেন্দ্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু জাতীয় চেতনার মধ্যে সেই প্রাচীন রাষ্ট্রগঠনের নীতি এখনও অনুস্যূত রহিয়াছে। তাই ভারতবাসী বিদেশী শাসনতন্ত্র কিছুতেই গ্রহণ করিতে, বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না। বর্ত্তমানে আমাদের রাজনীতিকগণ বিলাতের পার্লামেণ্টের অনুকরণে ভারতে স্বরাজ্য গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এরূপ পার্লামেণ্ট গবর্ণমেণ্ট যে আমাদের দেশের ধাতে সহিবে না সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য দেশের যে পার্লামেণ্ট পদ্ধতি তাহাতে দেশবাসী প্রকৃত স্বাধীনতা পায় না, কেবল স্বাধীনতার একটা বাহ্যিক আভাস মাত্র হয়। জনসাধারণের নিকট হইতে ভোট লইয়া কতকগুলি প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয় এবং তাহারাই শাসনযন্ত্র পরিচালন করে। কিন্তু সমস্ত দেশের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সম্যকভাবে বুঝিয়া ঠিকভাবে ভোট কয়জন দিতে পারে? যাহাদের অর্থ আছে সামর্থ্য আছে তাহারা কলে কৌশলে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়। তাহার পর দেশের সমস্ত জীবনের উপরে তাহারা যথেচ্ছা শাসন চালায়। দেশবাসীর প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা কোন

বিভাগেই নাই। কিন্তু ভারতের প্রাচীন রাষ্ট্র পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন সঙ্ঘের ভিতর দিয়া দেশবাসী প্রকৃতপক্ষেই নিজেদের শাসন কার্য্য নিজেরাই চালাইত, এবং জীবনের সকলক্ষেত্রে,জাতির সকল অঙ্গে পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজ করিত। ভারতের প্রাচীন সঙ্ঘগুলি ঠিক সেইভাবে আবার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে, তাহার প্রয়োজনও নাই। যেমন সকল ক্ষেত্রে তেমনিই রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশ অবশ্যম্ভাবী। তবে ভারতের রাষ্ট্র-নীতির বিকাশ করিতে হইলে আমাদিগকে ভারতীয় জীবনের বিশেষ ধারারই অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। সমস্ত দেশের মধ্যে অসংখ্য প্রকার স্বতন্ত্র (autonomous) কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে, এবং আপন আপন প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও ধর্ম্ম অনুযায়ী সকলকে স্বাধীন ভাবে বিকশিত হইবার পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। প্রকৃত স্বরাজ্যের ভিত্তি এই ভাবে স্থাপিত হইলে ভারতের জাতীয় জীবন বিকাশের উপযোগী জীবন্ত শাসনতন্ত্র ভিতর হইতেই গড়িয়া তুলিবে।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০

অন্বয়। হে কৃষ্ণ, অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি ; হে বার্ষ্ণেয়, স্ত্রীষু দুষ্টাসু বর্ণসঙ্করঃ জায়তে ॥

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ, অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে কুলস্ত্রীগণ

দুশ্চরিত্রা হয়; হে বৃষ্ণিবংশাবতংস, কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে ॥

ব্যাখ্যা

অধর্ম্মাভিভবাৎ—ধর্ম্ম শব্দের ধাতুগত অর্থ হইতেছে, যাহাকে ধরা যায়, যাহাকে ধরিয়া মানুষ জীবনের পথে অগ্রসর হয়। যে সকল নৈতিক, সামাজিক, কৌলিক বিধি-নিষেধ, আচার-ব্যবহার পালন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, ভারতবর্ষে ধর্ম্ম শব্দে সাধারণতঃ তাহাই বুঝায়। ইংরাজিতে যাহাকে বলে, The religious, social and moral rule of conduct, ভারতবর্ষে এক "ধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা তাহাই বুঝায়। এই সকল ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলিলেই মানুষের কল্যাণ, নতুবা অকল্যাণ—ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস। শাস্ত্রগ্রন্থে এই সব ধর্ম্ম বিবৃত থাকে। মানুষের মধ্যে আছে নীচ প্রবৃত্তির প্রেরণা, ইন্দ্রিয়ের প্রেরণা; বিধি নিষেধের দ্বারা সেই সকলকে সংযত ও শাসিত করা হয় বলিয়াই ঐ সকল বিধিনিষেধের নাম শাস্ত্র। কুলক্ষয় হইলে কুলে উপযুক্ত লোকের অভাব হয়, তাহাতে কুলের শৃঙ্খলা ও শিক্ষা নষ্ট হয়, ধর্ম্ম অনুসারে নীচের প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিতে যে আদর্শ, যে শাসন প্রয়োজন তাহার অভাবে কুলের লোক সব নীচ প্রবৃত্তির বশ হইয়া পড়ে, রিপুর বশ হইয়া পড়ে। এই ভাবে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে, কুলস্ত্রী-

গণও চরিত্রহীনা হয়, উচ্চ সতীত্বের আদর্শ, "কুলের ধর্ম্ম" আর তাহারা রক্ষা করিতে পারে না।

প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ--অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে স্ত্রীলোকগণ দুষ্ট হয়। এখানে স্ত্রীলোকদের দোষ শব্দে বুঝাইতেছে, পর পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ। এইরূপ সংসর্গের ফলে কুলের পবিত্রতা নষ্ট হয় এই জন্যই ইহা দোষ। এই দোষের আর এক নাম কলঙ্ক। স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে কুলটা বলা হয়, কারণ এরূপ ব্যভিচারের ফলে কুলে ভিন্ন জাতীর লোকের ঔরসে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

বার্ষ্ণেয়—অর্জ্জুন এখানে কুলের পবিত্রতা রক্ষার কথা বলিতেছেন। কৃষ্ণ বিখ্যাত বৃষ্ণিবংশজাত, তিনি কুলের মর্য্যাদা নিশ্চয়ই বুঝেন, এইজন্য এখানে কৃষ্ণকে অর্জ্জুন "বার্ষ্ণেয়" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

বর্ণসঙ্করঃ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণ। পুরাকালে গুণ কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে, স্বভাব ও শক্তি অনুসারে মানুষকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা হইত। এইরূপ বিভাগের ফলে সমাজে বেশ শৃঙ্খলা থাকিত। কাহাকে কিরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহার জন্য বিশেষ কোন গোলমাল করিতে হইত না, আপন আপন স্বভাব ও শক্তি অনুসারে কর্ম্ম করাই সকলের পক্ষে কল্যাণকর। যার জ্ঞান চর্চ্চা, অধ্যয়ন অধ্যাপনাই স্বভাবানুযায়ী তাহার পক্ষে যুদ্ধ-

বিগ্রহ কল্যাণকর নহে, আবার যুদ্ধই যাহার স্বভাবের অনুযায়ী তাহার পক্ষে বাণিজ্য ব্যবসা উপযোগী নহে। এই নীতি অনুসারে সমাজকে চারিভাগে ভাগ করা হইয়াছিল। কিন্তু মানুষের স্বভাব ও শক্তির হিসাব করিয়া সকল সময়ে তাহার বর্ণ নির্ণয় করা সম্ভব নহে—অতএব কালক্রমে এই বিভাগ জন্মগত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ছেলে ক্ষত্রিয এই ভাবেই বর্ণ বিভাগ কার্য্যতঃ চলিতে থাকে। ভারতবর্ষে heredity বা বংশের প্রভাব খুব শক্তিশালী বলিয়াই গণ্য হইত। যে যে বংশে জন্ম গ্রহণ করে, সে সেই বংশের গুণ পায় এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। তাহা ছাড়া বংশানুগত আদর্শ দৃষ্টান্ত শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা মানুষ স্বভাবতঃ সহজেই বংশের প্রকৃতি লাভ করিত। আজকাল যেমন সৈন্য সংগ্রহের জন্য আইন কানুন করিতে হয়, Conscription করিতে হয়, নানা প্রলোভন দেখাইতে হয়, আগে আমাদের দেশে সেরূপ ছিল না। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল। তেমনিই ব্রাহ্মণের বংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিত তাহাদের পক্ষে বেদ বেদান্তের আলোচনা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা খুব সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। যাহাতে বংশের এই ভাব নষ্ট হইয়া না যায়, বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণে মানুষের স্বভাব ও গুণের বিশৃঙ্খলা না হয় এই জন্য প্রাচীন কালে লোকে বর্ণসঙ্করকে এত ভয় করিত। সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।

অর্জ্জুন যে বর্ণসঙ্করের ভয় করিয়াছিলেন, কালের গতিকে ভারতে তাহাই হইয়াছে এবং খুব সম্ভব কুরুক্ষেত্রে যে ভীষণ ধ্বংসকার্য্য করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না সেই লোকক্ষয়ের ফলেই ভারতে বর্ণসঙ্কর হয় এবং অসংখ্য জাতি ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তবে ভগবান কেন অর্জ্জুনকে এই ভীষণ কুলক্ষয়কারী যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ প্রোৎসাহিত করিলেন ? ভগবানের ইচ্ছা কখন কি ভাবে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া চলে মনুষ্য-বুদ্ধি লইয়া তাহার হিসাব লইতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। ঐ ইচ্ছা মানুষকে তাহার চরম লক্ষ্যের দিকে, ভাগবত জীবনের দিকে লইয়া যাইতেছে, ভগবান মানুষকে নিজের মধ্যেই তুলিয়া লইতেছেন—কিন্তু তাঁহার এই কাজের ধারা কখন কি পথে চলে তাহা মনুষ্যের জ্ঞানের অতীত। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে যেটাকে মহা সর্ব্বনাশ বলিয়া মনে হয়, সেইটার ভিতর দিয়াই হয়ত আমরা পরম মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হই ; আবার আমাদের বুদ্ধিতে যেটাকে পরম কল্যাণকর বলিয়া বোধ হয় সেইটাই হয়ত আমাদের ঊর্দ্ধগমনকে বাধা দেয়, ভাগবত জীবন লাভের পরিপন্থী হয়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া দেখিলে মনে হয় যে, আর্য্যদের বর্ণসঙ্করভীতি অতিমাত্রায় চড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথমতঃ, প্রাচীন যে চারিবর্ণ বিভাগ তাহা একেবারে নির্দ্দোষ বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল না, তবে তাহার দ্বারা সমাজে একটা

কাজচলা শৃঙ্খলা হইয়াছিল। কিন্তু মানুষ ক্রমে উহাতে এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহার প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশ অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কুলের পবিত্রতা রক্ষা করা, রক্তের মিশ্রণ নিবারণ করা ততদিনই সার্থক, যতদিন কুল থাকে সতেজ, সজীব, যত দিন কুল অন্তর্নিহিত জীবনী শক্তির বলে আপনাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া চলিতে পারে। কিন্তু কালবশে যখন সেই শক্তি ক্ষীণ হইয়া আইসে, যখন কুলের ধর্ম্মপালন হয় অন্ধ নিয়মানুবর্ত্তিতা ও কুসংস্কারের অনুসরণ, কুলের রীতিনীতি হয় অর্থহীন শৃঙ্খলা মাত্র, তখন সেই কুল শুধু আপনাকে লইয়াই আর বাঁচিয়া থাকিতে পারে না—তখন তাহার নূতন রক্তের (infusion of fresh blood) প্রয়োজন হয়, বিভিন্ন প্রকারের রক্তের সহিত সংমিশ্রণই হয় তখন নবজীবন লাভের উপায়। কিন্তু বহুদিনের সংস্কারের বশে কুলের নেতৃগণ এইরূপে কুলভঙ্গ করিতে সম্মত হন না। কুলের পবিত্রতা নষ্ট হইলে সকলকে নরকে পতিত হইতে হইবে এই বৃথা আশঙ্কায় তাঁহারা ক্ষীণ মরণোন্মুখী জীবনীশক্তি লইয়া আপনার মধ্যে আপনিই নিবদ্ধ থাকিতে চান। তখনই ভগবানকে আসিতে হয়—মহাকালরূপে ধ্বংসমূর্ত্তি লইয়া। ভারতের কল্যাণের জন্যই কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসকার্য্য ভগবানের ইচ্ছাতে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।'

কুরুক্ষেত্রের মহাধ্বংসের ফলে প্রাচীন ভারতের জাতীয়

জীবনের নানা আবর্জ্জনা, নানা অর্থহীন আচার ব্যবহারের কঠিন নিগড় ধ্বংস হইয়া ভারতে আবার নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী সুদীর্ঘ ইতিহাস সেই অপরূপ অভ্যুদয়ের ইতিহাস। শিল্পে সাহিত্যে, ঐশ্বর্য্যে সম্পদে, বলে বীর্য্যে, শিক্ষায় দীক্ষায় ভারত যে কত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল আজও তাহার সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু আবার ধর্ম্ম গ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে, অসংখ্য অর্থহীন বিধিনিষেধের চাপে, দেশাচার, লোকাচার, কুলাচারের চাপে জাতির জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, সমাজের প্রতি অঙ্গ যেন পচিয়া ধ্বসিয়া উঠিয়াছে, তাই আবার বুঝি ভগবানের শঙ্খধ্বনি শোনা যাইতেছে, সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে সর্ব্বত্র মহাধ্বংস, মহাবিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। এই ধ্বংস ও বিপ্লবের ভিতর দিয়াই জাতি তাহার সমস্ত গ্লানি ঝাড়িয়া ফেলিবে, সনাতন ধর্ম্মের নবশক্তিতে, নব কলেবর ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব মহিমায় নূতন জীবনে গড়িয়া উঠিবে।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১

অন্বয়—সঙ্করঃ কুলঘ্নানাং কুলস্য চ নরকায় এব [ভবতি] হি এষাং পিতরঃ লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পতন্তি।

অনুবাদ—বর্ণসঙ্কর কুল ও কুলনাশকগণের নরক প্রাপ্তির হেতু, কেননা তাহাদের পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডোদক হইতে বঞ্চিত হইয়া পিতৃলোক হইতে পতিত হন।

ব্যাখ্যা

সঙ্করো নরকায়ৈব—অর্জ্জুন বলিলেন, যাহাদের দোষে কুলের মধ্যে বর্ণসঙ্কর প্রবেশ করে, তাহারা এবং সমস্ত কুল নরকে পতিত হয়। এই যে, নরকের ভয় দেখাইয়া লোককে সামাজিক অন্যায় আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিবার প্রথা, ইহা বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, এবং অর্জ্জুন এখানে তৎকাল প্রচলিত ভাব ও ভাষারই প্রয়োগ করিয়াছেন। সমাজের কল্যাণের জন্য বহুদর্শী নেতৃগণ আদর্শ রীতি নীতি, আচার ব্যবহার নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন এবং সমাজের অন্তর্গত সকল ব্যক্তিকে ঐ সকল রীতি নীতি পালন করিতে হইত। অনেক সময়েই সামাজিক রীতি নীতি ব্যক্তিগত আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, কামনা, ব্যক্তিগত সুখ স্বার্থের বিরোধী হয়, এরূপ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির প্রেরণায় লোক যাহাতে সামাজিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিয়া সমাজের অনিষ্ট না করে সেই জন্য সাধারণকে মরণান্তে ভীষণ নরকবাসের ভয় দেখান হইত। কিন্তু বস্তুতঃ এই নরক একটি রূপক ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাস্তবিকপক্ষে পৃথিবীর নিম্নভাগে পাপিগণের সাজা ভোগের নিমিত্ত নরক বলিয়া কোন স্থান নাই। যমরাজা বিচার

করিতেছেন, চিত্রগুপ্ত হিসাব রাখিতেছেন, যমদূতগণ পাপীগণকে অশেষ প্রকার সাজা দিতেছে এ সবই মানুষের কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পৌরাণিক কবিগণ নিজেদের কল্পনায় যত ভীষণ যন্ত্রণার ছবি আঁকিতে পারিয়াছেন সেই সবের সমাবেশে এমন নরক রাজ্যের বর্ণনা করিয়াছেন যে, অতি বড় অবিশ্বাসীর প্রাণেও আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

বাস্তবিকপক্ষে নরক অর্থে অধোগতি বা পতন। জীবমাত্রেই ক্রমশঃ দিব্যজীবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সকলের মধ্যেই যে ভাগবতসত্ত্বা রহিয়াছে, আপন আপন কর্ম্ম অনুসারে সকলেই তাহার বিকাশ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু আমাদের কর্ম্মের ফলে যখন আমাদের আত্মবিকাশের বিঘ্ন হয়, যখন উপরের দিকে না উঠিয়া আমরা নীচের দিকে নামিয়া পড়ি, তখনই হয় আমাদের পতন, অধোগতি এবং ইহাকেই রূপকছলে নরক বলা হইয়াছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নরক বলিতে এই অধোগতি, অধমাংগতিং বুঝাইয়াছেন। ষোড়শ অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,

> ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
> কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥

"কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার, আত্মার অবনতি সাধনের মূল; অতএব এই তিনটি ত্যাগ করিবে।"

যেখানে রিপুর বশ্যতা নাই, অন্তরে কামক্রোধাদির প্রেরণা নাই, সেখানে বাহ্যিক যে কোন বিধি, নিষেধ বা আচার

ব্যবহারের লঙ্ঘন করা যাউক না কেন, তাহাতে কোন পাপ হইতে পারে না, আত্মার কোনই অনিষ্ট হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে-স্ত্রীলোকের উপর বল-প্রয়োগ করিয়া "সতীত্ব" নষ্ট করা হয়, তাহার কোনই পাপ হয় না এবং তাহার কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তেরই প্রয়োজন নাই।

পতন্তি পিতরো—কুলে বর্ণসঙ্করের হেতু হইলে শুধু যে, আপনাদিগকেই নরকে যাইতে হইবে তাহা নহে, পূর্ব্বপুরুষ-গণও তাঁহাদের উচ্চলোক হইতে পতিত হইবেন। এই যে, মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের পরলোকের মঙ্গলকামনায় পিণ্ড, জল প্রভৃতি দান করার প্রথা—ইহারও মূলে রহিয়াছে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা। পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা বজায় থাকিলে, কুলের পবিত্রতা রক্ষা করিতে লোকে বিশেষ যত্নবান হইবে। আমাদের প্রাচীন সমাজকর্ত্তৃগণ সমাজের পক্ষে যেটা ভাল বিবেচনা করিতেন, সাধারণকে তাহার অনু-বর্ত্তী করিবার জন্য কতরূপ উপায় অবলম্বন করিতেন তাহা বিশেষ অনুধাবন করিবার বিষয়। কিন্তু বর্ত্তমানে লোকের মতিগতি, ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এখন সমাজে শৃঙ্খলা রাখিবার জন্য সেই প্রাচীন-যুগের পদ্ধতি সব আর মোটেই উপযোগী নহে ; এবং অধি-কাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি অর্থহীন গতানুগতিক কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে।

লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়া—যাহারা একরক্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারাই পিণ্ড দিবার অধিকারী। কুলের মধ্যে অপর জাতির লোকের দ্বারা সন্তান উৎপাদিত হইলে তাহাদের দত্ত পিণ্ডোদক কুলপুরুষগণ গ্রহণ করিতে পারেন না। অতএব বর্ণসঙ্কর হইলে পিণ্ডোদকের লোপ হয়, ফলে পূর্ব্বপুরুষগণ নরকে পতিত হন।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, চারি বর্ণবিভাগের পবিত্রতা রক্ষা করা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বিবেচিত হওয়ায়, সমাজপতিগণ বর্ণসঙ্কর নিবারণ করিতে অতিশয় ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু সাধারণে এই সব সমাজতত্ত্ব বুঝিবে না, তাই তাহাদিগকে বর্ণসঙ্কর দ্বারা পূজনীয় পিতৃপুরুষগণের পতনের ভয়ই দেখান হইয়াছে।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪২

অন্বয়।—কুলঘ্নানাং এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ উৎসাদ্যন্তে।

অনুবাদ।—কুলনাশকদের এই বর্ণসঙ্করোৎপাদক দোষসকলের ফলে সনাতন জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম সকল উৎসন্ন হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা

জাতিধর্ম্মাঃ।—এখানে ধর্ম্ম বলিতে ইংরাজীতে যাহাকে Religion বলে তাহা বুঝাইতেছে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য, শূদ্র ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ছিল। প্রত্যেক বর্ণের ছিল বিশিষ্ট আদর্শ, বিশিষ্ট রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, বিশিষ্ট কর্ম্ম—এবং তাহাকেই ধর্ম্ম বলা হইত। সংযম, শুচিতা, তপস্যা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এই সব ছিল ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। যুদ্ধ, রাজ্যপালন, দান ইত্যাদি ছিল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, বৈশ্যের ধর্ম্ম এবং পরিচর্য্যা শূদ্রের ধর্ম্ম। এই যে কর্ম্মের বিভাগ ইহা স্বভাব, শক্তি, গুণের তারতম্য অনুযায়ী ছিল—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তাণি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ১৮।৪১

কিন্তু প্রাচীন কালের এই যে, গুণ ও স্বভাব অনুসারে বিভাগ ইহা বেশী দিন টিঁকে নাই। মানুষের গুণের বিচার করিয়া তাহাদের শ্রেণী-বিভাগ কে করিয়া দিবে? ক্রমশঃ এই শ্রেণী-বিভাগ জন্মগত হইয়া পড়ে এবং এই ভাবে বর্ণ-বিভাগ জাতি-বিভাগে পরিণত হয়। পুরাকালে ব্রাহ্মণেরা খুবই উচ্চ শিক্ষা ও দীক্ষার অধিকারী ছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের সন্তানেরা যে, সকল সময়েই সেই সব উচ্চ গুণ পাইতেন তাহা নহে, কাজেই ব্রাহ্মণাদি জাতি-বিভাগ কাল-ক্রমে বস্তুতঃ একটা অর্থহীন সংস্কারে পরিণত হয়। ক্রমে ব্যবসা ও বৃত্তিই হয় জাতি বিভাগের ভিত্তি। প্রাচীনকালে যেমন গুণের তারতম্যানুসারে মানুষের শ্রেণী বিভাগ করা যাইত, পরবর্ত্তীকালে ব্যবসা ও বৃত্তির তারতম্যানুসারে

জাতির বিভাগ করা হয়। সমাজে নানা ব্যবসা, নানা বৃত্তি—অতএব, নানা জাতিরও সৃষ্টি হয়। এইরূপ অর্থনীতিক বিভাগ সমাজের পক্ষে হিতকর ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে জাতি-বিভাগ যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার কোন অর্থই নাই। বংশের ব্যবসা যে অবলম্বন করিতে হইবে এমন কোন প্রথা এখন নাই—যাহার যেমন সুবিধা সে তেমনিই ব্যবসা অবলম্বন করিতেছে। এখন যত জাতির বিচার শুধু নিমন্ত্রণ খাইবার সময় এবং বিবাহের সময়। ইহাতে সমাজের কোন উপকার হয় না, বরং স্বাধীন জীবনবিকাশের পক্ষে অশেষ বাধার সৃষ্টি হয়। এককালে যাহা ছিল সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার একটা উপায় বর্ত্তমানে তাহা বিষম অনিষ্টকর শৃঙ্খলে পরিণত হইয়াছে।

অর্জ্জুন জাতি বলিতে এখানে কি বুঝিয়াছেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বিভাগকে তৎকালে বর্ণ বিভাগ বলা হইত, জাতিবিভাগ বলা হইত না। জাতি শব্দের মূল অর্থ হইতে বুঝা যায়, জন্মগত ঐক্য। এক পূর্ব্বপুরুষ হইতে যাহারা উদ্ভূত হইয়াছে তাহাদিগকে লইয়া কুল হইত, কিন্তু কুল যখন খুব প্রকাণ্ড হইয়া পড়িত তখন এক কুলই বিভক্ত হইয়া নানা কুলে পরিণত হইত—এইরূপে একই পূর্ব্বপুরুষ হইতে যে-সকল বিভিন্ন কুল উৎপন্ন হইত তাহাদের সমষ্টিকেই বোধ হয় জাতি বলা হইত। কিন্তু অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে জাতি-ধর্ম্মের কথা

বলিয়াছেন, তাহাতে আর্য্য অনার্য্যের প্রভেদ করা হইয়াছে। আর্য্যের ধর্ম্ম, আর্য্যের আদর্শ অনার্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। যাহাই হউক, অর্জ্জুন এখানে জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম বলিতে সমাজপ্রচলিত রীতিনীতি আদর্শের কথা, আচার ব্যবহারের কথাই বলিয়াছেন। যাহারা বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি করে, তাহারা সমাজের রীতি নীতি, আচার ব্যবহারের বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করে, ইহাই অর্জ্জুনের বক্তব্য।

এই যে সামাজিক রীতি নীতির আদর্শ ক্ষুন্ন হইবার ভয় অর্জ্জুন করিতেছেন, ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সমাজের আদর্শ অনুকরণ করিয়া চলিলে যে কল্যাণ হয় তাহা খুবই ঠিক। কিন্তু মানুষের ক্রমবিকাশের সহিত সামাজিক আদর্শের, সামাজিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশ প্রয়োজন—সাধারণতঃ মানুষ এইটা বুঝে না, প্রচলিত আইন কানুন, রীতিনীতিকেই সনাতন, "শাশ্বতাঃ" বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়—ইহাতে জাতির জীবনবিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মের শাশ্বত, সনাতন অংশ আছে। সে সব হইতেছে আধ্যাত্মিক সত্য। আত্মা কি, জীব কি, ভগবান কি, জগৎ কি, এই সবের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি—তাহাই চিরন্তন সত্য। প্রত্যেক জীব ভগবানেরই অংশ—প্রত্যেক জীবের মধ্যে ভগবানের অংশ নিহিত রহিয়াছে, প্রত্যেক জীবের প্রকৃতি বা স্বভাব ভাগবত প্রকৃতিরই এক একটি রূপ—ক্রমবিকাশের

দ্বারা জীবকে ভাগবত-জীবন লাভ করিতে হইবে। এই ক্রমবিকাশের জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন আদর্শ, বিভিন্ন রীতি নীতির অনুসরণ করিতে হয়—যাহা এক যুগের পক্ষে উপযোগী, তাহা আর এক যুগের পক্ষে উপযোগী নহে। মানুষ যখন এই নিগূঢ় সত্য ভুলিয়া যায়, প্রাচীন অনুপযোগী রীতিনীতিকে 'শাশ্বতাঃ' বলিয়া ধরিয়া থাকিয়া জীবনের ক্রমবিকাশকে বিপর্য্যস্ত করে, তখন ভগবান অবতীর্ণ হন বিপ্লবের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া—তখন তিনি প্রকৃত যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়া মানুষের ভিতরের সংশয় দূর করিয়া দেন এবং বাহিরে ধ্বংসের দ্বারা সমাজের গ্লানি দূর করিয়া নূতন জীবনবিকাশের পথ করিয়া দেন। অর্জ্জুনের যে "ধর্ম্মভয়", যুগে যুগে মানুষ সেই ভয়ের বশে অগ্রসর হইবার পথ দেখিতে পায় না—তখন ভগবানকে আসিতে হয় পথ দেখাইয়া দিতে, অভয় দিতে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ৪৩

অন্বয়।—হে জনার্দ্দন, উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নরকে বাসঃ নিয়তং ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম।

অনুবাদ।—হে জনার্দ্দন, যাহাদের কুলধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে সেই সব মনুষ্যকে নরকে বাস করিতে হয়, ইহাই শুনিয়াছি।

ব্যাখ্যা

নরকে নিয়তং বাসো।—কুলের বাহ্যিক, আচার ব্যবহার বিনষ্ট হইলে মানুষকে নরকে বাস করিতে হয়, ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, এই সব আচার ব্যবহারের প্রয়োজন সমাজের ঐহিক কল্যাণেরই জন্য। এই কল্যাণের জন্যই যখন ঐ সকল আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়, তখন মিথ্যা নরকের ভয়ে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সমাজের অকল্যাণই করা হয়। এইভাবে "ধর্ম্মের" দোহাই দিয়া, নরকের ভয় দেখাইয়া বস্তুতঃ সমাজের যে অকল্যাণ করা হয়, গীতা অর্জ্জুনের মোহে তাহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইয়াছে।

ইত্যনুশুশ্রুম।—অর্জ্জুন বলিলেন, আমি এইরূপই শুনিয়াছি। তিনি এখানে বর্ণসঙ্কর, পিণ্ডোদক-লোপ, নরকবাস প্রভৃতি যে সব কথা বলিয়াছেন, সে সব গীতার শিক্ষার অন্তর্গত নহে। সে সব অর্জ্জুনেরই কথা—অর্জ্জুন তৎকাল-প্রচলিত ধর্ম্মাধর্ম্মের আদর্শ, সমাজের আদর্শ যেমন জানিতেন, যেমন শুনিয়াছিলেন সেই মত এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহার তামসিকতাকেই সমর্থন করিয়াছেন।

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪

অন্বয়।—অহোবত! বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ যৎ রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ।

অনুবাদ।—হায়! আমরা কি মহাপাপই না করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি? রাজ্যসুখের লোভে স্বজনগণকে হত্যা করিতে যাইতেছি।

ব্যাখ্যা

অহোবত মহৎ পাপং।—যুদ্ধ করিতে এইটাই অর্জ্জুনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় আপত্তি যে, এই গৃহযুদ্ধকে মহাপাপ বলিয়াই তাঁহার বোধ হইতেছে। মানুষের মধ্যে পাপ-পুণ্যের যে বোধ রহিয়াছে তাহাকে অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। মানুষ যুক্তি-তর্কের দ্বারা সকল সময়ে কর্ম্মের ভাল মন্দ স্থির করিতে পারে না—এরূপ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের একমাত্র উপায় অন্তরের মধ্যে পাপ-পুণ্যের বোধ—ইংরাজীতে যাহাকে বলে Moral sense, Conscience। অর্জ্জুনকে বলা চলিত, "পাপ-পুণ্য বোধ, Conscience, ও সব মনের দুর্ব্বলতা, শত্রুকে জয় করিয়া দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, এ সময়ে ইচ্ছাশক্তির জোরে পাপ-পুণ্যবোধকে পদদলিত করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তোমার কর্ত্তব্য করিয়া যাও, ইহাই বীরের ধর্ম্ম।" জর্ম্মণ দার্শনিক নীট্‌শে এই অবস্থায় অর্জ্জুনকে এই শিক্ষাই দিতেন। পাশ্চাত্য রাজনীতিকেরা রণক্ষেত্রে সৈন্যগণকে এই ভাবেই "কর্ত্তব্য" ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়। কিন্তু গীতা তাহা করে নাই। গীতা অর্জ্জুনকে পাপ-পুণ্যের বোধ পদদলিত করিতে বলে নাই,

পাপ-পূণ্যকে উড়াইয়াও দেয় নাই। অন্তরের মধ্যে কি ভাব লইয়া কর্ম্ম করিলে কিছুতেই পাপ হয় না, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেই গভীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়াছেন। যতক্ষণ না সেই আধ্যাত্মিক শিক্ষা অনুসরণ করিয়া জীবনকে গঠন করিতে পারা যায়, যতক্ষণ না সকল পাপ-পূণ্যের অতীত আত্মার শান্ত, অবিকল্প ঐক্য ও সমতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, ততক্ষণ পাপ-পুণ্যবোধকে অগ্রাহ্য করিলে মানুষের আধ্যাত্মিক পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অর্জ্জুন এখনও সেই আধ্যাত্মিক সমতার অবস্থা লাভ করেন নাই। এখনও তাঁহার মধ্যে পাপ-পুণ্য বোধ রহিয়াছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বুঝাইয়া দিলেন যে, স্বধর্ম্মের পালনই পুণ্য, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগই পাপ। এই ধর্ম্মযুদ্ধ করিলে অর্জ্জুনের পাপ হইবে না, কারণ ইহা তাহার ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, বরং এই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেই তাহার পাপ হইবে,

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥

কিন্তু অর্জ্জুনের পাপ-পুণ্যের বিরোধ ইহাতে দূর হইল না। ধর্ম্ম-যুদ্ধ করা তাহার কর্ত্তব্য বলিতেছেন? কিন্তু যে যুদ্ধে জ্ঞাতি হত্যা, গুরু হত্যা, করিতে হয়—তাহা কেমন করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে পারে? তাঁহার কর্ত্তব্য হইতে পারে? অর্জ্জুন যে এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের তাহাই ইচ্ছা ছিল, কারণ তিনি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যকে উচ্চ

আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করিতে অভিলাষী। তাই যখন "ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পালন কর," এই উপদেশে অর্জ্জুন সন্তুষ্ট হইলেন না, যখন তাহার হৃদয় হইতে পাপের ভয় দূর হইল না, তখন শ্রীকৃষ্ণ গীতার গভীরতর আধ্যাত্মিক শিক্ষা আরম্ভ করিলেন, অন্তরের মধ্যে কি ভাব, কি চেতনা লাভ করিলে কোনও অবস্থাতে, কোনও কর্ম্মেই পাপ স্পর্শ করিতে পারে না তাহাই বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন,

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

যদ্রাজ্যসুখলোভেন।—অর্জ্জুন উপলব্ধি করিতেছেন, যেটাকে তাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধ, ন্যায়যুদ্ধ প্রভৃতি বড় বড় কথা দিয়া সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সেটা ঘোর স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাস্তবিক পক্ষে নিজের ভ্রাতাদের, নিজের বন্ধু-বান্ধবগণের রাজ্যভোগ, সুখ-ভোগের জন্যই কি এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অবতারণা নহে? নিজেদের তুচ্ছ ভোগসুখের জন্য আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করা, ইহা অপেক্ষা মহাপাপ আর কি হইতে পারে? না বুঝিয়া কি পাপই করিতে যাইতেছিলেন, ইহা ভাবিয়া অর্জ্জুন শিহরিয়া উঠিলেন, অহোবত!

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫

অন্বয়।—যদি অপ্রতীকারম্ অশস্ত্রং মাং ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুঃ, তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।

অনুবাদ।—আমি প্রতীকারের কোন চেষ্টা করিব না, হস্তে অস্ত্রও রাখিব না, এরূপ অবস্থায় সশস্ত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যুদ্ধক্ষেত্রে যদি আমাকে হত্যা করে, আমার পক্ষে তাহাই ভাল হইবে।

মামপ্রতীকারম্।—অর্জ্জুন ঘোর তামসিকতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। আততায়ীকে আক্রমণ করা দূরে থাকুক, আত্মরক্ষা করিতে এমন কি হস্তে অস্ত্রধারণ করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি নাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ নিশ্চেষ্ট. নিরস্ত্রভাবে থাকিলে শত্রু ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাকে বিনাশ করিবে, সে সম্ভাবনা সত্বেও অর্জ্জুনের যুদ্ধে উদ্যম হইল না—তাঁহার হৃদয় অতি গভীর ভাবে অবসন্ন। চিরদিন যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন, আজ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ নিরস্ত্র অবস্থায়, অন্যায় যুদ্ধে তাঁহাকে হত্যা করিলেও তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন থাকিবেন।

ক্ষেমতরং ভবেৎ।—এই অবস্থায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেই তাঁহার ভাল হইবে. অর্জ্জুনের মনে হইল। অর্জ্জুন স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছেন, বীরের কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হইতেছেন, ইহা তিনি বেশই বুঝিতেছিলেন, ইহাতে তাঁহার যে অকীর্ত্তি ও অপমান হইবে তাহা মরণ

অপেক্ষাও বেশী, মরণাদতিরিচ্যতে। অথচ এই কর্ত্তব্য পালন করিতেও তাঁহার বিন্দুমাত্র সামর্থ্য নাই। এই অবস্থায় মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তাই অর্জ্জুন ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহাকে নিরস্ত্র দেখিয়া এখনই যদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাকে হত্যা করে, তাহা হইলে তাঁহার সকল দুঃখ ও অশান্তির অবসান হয়।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বাহর্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ, শোকসংবিগ্নমানসঃ অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সংখ্যে সশরং চাপং বিসৃজ্য রথোপস্থ উপাবিশৎ।

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন, এই বলিয়া শোকার্ত্ত অর্জ্জুন রণক্ষেত্রে সশর ধনু পরিত্যাগ করিয়া রথের উপর বসিয়া পড়িলেন।

ব্যাখ্যা

এবমুক্ত্বা—অর্জ্জুনের ধারণা, যুদ্ধ না করার বিরুদ্ধে এতক্ষণ তিনি যাহা বলিলেন সে যুক্তি অকাট্য। ইহার পর আর তাঁহার অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করা অন্যায়। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি যুক্তির বলে অস্ত্র ত্যাগ করেন নাই। শোকে, দুঃখে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, গাণ্ডীব তাঁহার হস্ত হইতে আপনিই খসিয়া

পড়িতেছিল। নিজের দেহ, প্রাণ, মনের সেই দুর্ব্বলতাকে, তামসিকতাকে জয় করিতে না পারিয়াই তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

সংখ্যে—অন্যস্থলে লোকের যতই দুর্ব্বলতা বা ভয় থাকুক, কিন্তু রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া জয়োল্লাস, শঙ্খধ্বনি, শস্ত্রসম্পাতের মধ্যে দাঁড়াইয়া অতি বড় ভীরুর প্রাণেও উৎসাহ ও সাহসের সঞ্চার হয়। কিন্তু অর্জ্জুনের ইহার বিপরীত হইল, তাঁহার অন্তরের গোলমাল অতি গভীর।

উপাবিশৎ—অর্জ্জুনের শরীর, মন এমন অবসন্ন যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবারও সামর্থ্য তাঁহার নাই, তিনি অবসন্ন হইয়া রথের উপর বসিয়া পড়িলেন।

বিসৃজ্য সশরং চাপং—কিরূপ সঙ্গীন অবস্থায় অর্জ্জুনের মোহ আসিয়াছে, এইখানে তাহা পুনরায় বলা হইল। তিনি রণক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত। এই মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে অর্জ্জুন যাহাতে ব্যবহার করিতে পারেন সেইজন্য দেবতাগণ তাঁহাকে গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই ধনুতে তিনি শরযোজনা করিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার হৃদয় শোকে অবসন্ন হইয়া পড়িল, "ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাকে নিরস্ত্র পাইয়া হত্যা করে তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয়, আমি এ যুদ্ধ করিব না" বলিয়া তিনি দেবদত্ত গাণ্ডীব পরিত্যাগপূর্ব্বক রথের উপর বসিয়া পড়িলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ-

শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাঽর্জ্জুন-সংবাদে অর্জ্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অনুবাদ—এই প্রকার শ্রীভগবান কর্ত্তৃক গীত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রবিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সংবাদে অর্জ্জুন-বিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

ব্যাখ্যা

ইতি—গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে এইরূপ যে অধ্যায়সমাপ্তিসূচক সঙ্কল্প দেওয়া আছে ইহা মূল মহাভারতে নাই। বোধ হয় নিত্যপাঠের জন্য যে সময় মহাভারত হইতে গীতাকে পৃথক করিয়া বাহির করা হয় তখন হইতেই এইরূপ সঙ্কল্প প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতাসু—গীতার শিক্ষা স্বয়ং ভগবানের মুখনিসৃত, এই জন্যই ইহার নাম শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিসৃতা। ভগবান মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানুষকে মানুষের মত শিক্ষা দেন, বর্ত্তমান এই নাস্তিকতার যুগে অনেকেই সে কথা বিশ্বাস করিবেন না। আমাদের শিক্ষিত সমাজে এই যে নাস্তিকতার ভাব আসিয়াছে, ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম্মেও খ্রীষ্টাবতারের কথা আছে, তিনি ভগবানের পুত্র, মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয়গণের ধর্ম্মে যাহাই থাকুক, তাহাদের জীবনে এই

বিশ্বাসের প্রভাব দেখা যায় না। ভগবান যদি থাকেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত পুরুষ, সামান্য মানুষের দেহের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব কেমন করিয়া সম্ভব? কিন্তু এরূপ আবির্ভাব হিন্দুর নিকট মোটেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ হিন্দুর জীবনে বেদান্তশিক্ষার প্রভাব সমধিক। বেদান্তমতে এক ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছুই নাই. জগতে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু হইতেছে, সে সবই ব্রহ্মের প্রকাশ, বা ব্রহ্মের আংশিক প্রকাশ। জীবও ব্রহ্মের অংশ, সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ, প্রত্যেক মানুষই এক হিসাবে ভগবানের অবতার। সকলের হৃদয়ের মধ্যেই চিরন্তন অবতাররূপে ভগবান বিরাজ করিতেছেন, অতএব কোন বিশেষ মানব-শরীরে যে অন্তর্য্যামী ভগবান বিশেষরূপে প্রকট হইবেন ইহাতে অসম্ভব কি আছে? অর্জ্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ভগবানেরই অবতার ছিলেন, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমার মানবদেহ দেখিয়া যাহারা অবজ্ঞা করে তাহারা মূর্খ, সর্ব্বভূতের মহান্ ঈশ্বর-রূপ আমার পরমতত্ত্ব তাহারা জানে না"। তবে ঠিক কুরুক্ষেত্রের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াই শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনকে সাত-শত শ্লোক শুনাইয়াছিলেন, এরূপ ধারণা না করিলেও গীতার শিক্ষা বুঝিতে কোন বাধা হয় না। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই যে কবির কল্পনা নহেন, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে বাস্তবিকই

ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণও অবতাররূপে পূজিত হইতেন, উপনিষদাদিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অবতার শ্রীকৃষ্ণ যে ভাগবত-ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই গীতাশিক্ষার ভিত্তি এবং অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, ইহাতে অসম্ভব কিছু নাই। তাহার পর গীতাকার সেই শিক্ষাকে বর্ত্তমান গীতার আকারে রচনা করিয়াছেন। তবে গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে যে ভাবে কুরুক্ষেত্রের মধ্যস্থলে রাখিয়া তাঁহাদের মুখ দিয়াই গীতাশিক্ষার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষাটি বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই এবং ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

উপনিষৎসু—"শ্রীভগবান কর্ত্তৃক গীত উপনিষৎ"—এখানে উপনিষৎ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ অতএব সংস্কৃত ভাষায় তাহার বিশেষণ হইয়াছে "গীতা"। "উপনিষৎ"—এই শব্দ মূলে না থাকিলে "ভগবদ্গীতম্" এইরূপ হইত। "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" সংক্ষেপে "গীতা" এই নাম প্রচলিত থাকায় বুঝিতে হইবে যে গীতা উপনিষৎ বলিয়াই গণ্য। কিন্তু বস্তুতঃ বেদের শেষ অংশকেই উপনিষৎ বলা হয়, গীতা তাহাদের অন্তর্গত নহে, বৈদিক যুগের বহু পরে রচিত। গীতার রচনাপদ্ধতিও উপনিষৎ হইতে বিভিন্ন। উপনিষদে গীতার

ন্যায় যুক্তি তর্কের ভিতর দিয়া তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয় নাই, ঋষিগণ দিব্যদৃষ্টিতে সত্যকে যেমন দেখিয়াছেন, রূপক ও উপমার ভিতর দিয়া সংক্ষেপে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন, যেন পাঠক বা শ্রোতারা নিজেদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও উপলব্ধি দিয়াই তাহা ধরিতে পারে। গীতা কিন্তু এমন ভাবে তত্ত্বের প্রচার করিয়াছে, যাহা মানুষের মন, বুদ্ধি যুক্তি দিয়াই বুঝা যায়। এইজন্য গীতাকে উপনিষদের ন্যায় শ্রুতিশাস্ত্র পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায় না।

তবে উপনিষদ্ই গীতাশিক্ষার ভিত্তি। গীতার পূর্ব্বে বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতিতে যে সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে, গীতায় সে সকলের সার সঙ্কলন ও সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। গীতাকে সমগ্র আর্য্যশিক্ষা-দীক্ষার সারবস্তু বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এইজন্য গীতা শ্রুতির ন্যায়ই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়, ত্রয়োদশ উপনিষদ্ রূপেই গণ্য হয়।

ব্রহ্মবিদ্যায়াম্।—বেদান্ত দর্শনের অন্য নাম ব্রহ্মবিদ্যা। বাদরায়ণ রচিত বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্র হইতেছে, "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা," এই সূত্রগুলিকে ব্রহ্মসূত্র বলা যায়। গীতা মূলতঃ বৈদান্তিক গ্রন্থ। বেদান্তশিক্ষার তিনটি প্রামান্য, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা—ইহাদিগকে প্রস্থানত্রয় বলা হয়। উপনিষদই বেদান্তশিক্ষার মূল; ব্রহ্মসূত্রে বিভিন্ন উপনিষদে বিক্ষিপ্ত ব্রহ্মতত্ত্বকে সূত্রাকারে

গ্রথিত করা হইয়াছে; গীতা উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করিয়া বৈদান্তিক শিক্ষার ভিত্তিতে অন্যান্য দর্শনের অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছে।

যোগশাস্ত্রে—অন্যান্য অধ্যাত্ম ও দর্শনশাস্ত্রের সহিত তুলনায় গীতার বিশেষত্ব এই যে, গীতা শুধু দার্শনিক তত্ত্ববিচারের গ্রন্থ নহে, সনাতন আধ্যাত্মিক সত্যসমূহকে অনুসরণ করিয়া জীবনকে কেমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, জীবনের নিগূঢ় সমস্যাসমূহের চরম সমাধান কেমন করিয়া করিতে হয়, গীতায় সেই কার্য্যকরী (practical) শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছে। শুধু তত্ত্বের বিচার গীতায় কোথাও বেশী দেখা যায় না; কিরূপ সাধনার দ্বারা মানুষ দিব্য জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে গীতা সেই বিষয়ের অমূল্য উপদেশে পরিপূর্ণ। গীতার সাধনার মূল কথা, ভগবানের সহিত যোগ। মানুষ সাধারণতঃ যে জীবন যাপন করে, নিজের দেহ, প্রাণ, মনের ধর্ম্মকে অনুসরণ করিয়াই চলে, ভগবানের সহিত তাহার সাক্ষাৎ কোন যোগ নাই। এরূপ জীবন নীচের জীবন, অবিদ্যা, মায়া, অপরা প্রকৃতির খেলা, এই জীবনকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা বলিয়াছে,—অনিত্যম্ অসুখম্ লোকং ইমম্ প্রাপ্য ভজস্ব মাম্। ভগবানের ভজনা করিয়া, ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া জীবন যাপন করিলে এই দুঃখদ্বন্দ্বময় অনিত্য সংসারই পরম আনন্দময় অমৃতময় হইয়া উঠে। মানুষ অন্ধভাবে

জীবনের পথে চলিতেছে, ভাগবতজ্ঞানে তাহা আলোকিত করিতে হইবে; পদে পদে মানুষ সংসারের বিভিন্ন শক্তির সহিত দ্বন্দ্বে লাঞ্ছিত হইতেছে, ভাগবত শক্তির সহিত যুক্ত হইয়া সংসারকে জয় করিতে হইবে; যে দিব্য আনন্দ-ধারার উপর জগৎ প্রতিষ্ঠিত, সেই আনন্দের অধিকারী হইতে হইবে; ইহার গূঢ় রহস্য হইতেছে ভগবানের সহিত যোগ। যোগই সংসারে দিব্য জ্ঞানময়, শক্তিময়, আনন্দময় জীবন লাভ করিবার কৌশল, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। কর্ম্মের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা ভগবানের সহিত এই যোগের সাধনা করিয়া মানুষ কেমন করিয়া এই অজ্ঞানময় জীবনকে অতিক্রম করিয়া দিব্য জীবন লাভ করিতে পারে, গীতায় ক্রমশঃ সেই শিক্ষারই বিকাশ ও বিস্তার করা হইয়াছে—এই জন্যই সাধারণভাবে গীতাকে যোগশাস্ত্র বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে।—গুরুশিষ্য-সংবাদরূপে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা করা ভারতের প্রাচীন রীতি, গীতা সেই রীতিরই অনুসরণ করিয়াছে। তবে গীতার বিশেষত্ব এই যে, অন্যত্র গুরু শিষ্য সাধারণতঃ কোন নির্জ্জন তপোবনে বসিয়া আধ্যাত্মিক আলোচনা করেন, এখানে মহাসমরক্ষেত্রে একজন সারথিরূপে অশ্বের বল্গা ধরিয়া আর একজন যোদ্ধারূপে ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া রথের উপর দণ্ডায়মান। জীবনরূপ কুরুক্ষেত্রে মানুষকে যে সব

সঙ্গীন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় তাহার নিগূঢ় সমাধান শিক্ষা দিতে হইলে এইরূপ "সংবাদই" প্রয়োজন।

গুরু যেমন শিষ্যের সামর্থ্য ও অবস্থা বুঝিয়া শিক্ষা দিয়া তাহাকে তৈয়ারী করেন এবং ক্রমশঃ তাহাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরের শিক্ষায় লইয়া যান, গীতায় আগাগোড়া কতকটা সেই রীতিই অনুসৃত হইয়াছে। গীতার শেষের দিকে যে সব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, নিম্নাধিকারীর পক্ষে তাহা উপযোগী নহে। প্রথম ছয় অধ্যায়ের মধ্যেই সাধনার যে সব সঙ্কেত দেওয়া আছে তাহা অতি উদার ও বিস্তৃত এবং প্রথম অবস্থার সাধকদের পক্ষে যথেষ্ট। এই সাধনা ঠিক ভাবে করিতে পারিলে, গীতার বাকী অংশের অমূল্য উচ্চ শিক্ষা সাধক নিজের হৃদয়ের মধ্যেই লাভ করিতে পারেন।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা দীক্ষার প্রণালী কিরূপ ছিল এই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ হইতে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান শিক্ষালয়সমূহে ছাত্র যতটা শিখিতে ব্যস্ত নহে, গুরু তাহা অপেক্ষা শিখাইতে ব্যস্ত। ছাত্র কি শিখিতে চায়, গুরুর সেদিকে লক্ষ্য নাই; ছাত্রকে কি শিখিতে হইবে গুরুই তাহা ঠিক করেন, গুরুর উপরওয়ালারা ও গবর্ণমেণ্ট সেই শিক্ষার কোর্স, Syllabus নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি এইরূপ ছিল না। ছাত্রকে জোর করিয়া কোন কিছু শিখান হইত না। ছাত্রকে এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে রাখা হইত, যেখানে ছাত্রের

মনে শিখিবার প্রবৃত্তি আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিত, ছাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গুরুকে ভক্তিভাবে নানা প্রশ্ন করিত, গুরু শিষ্যের সেই সব প্রশ্নকে অবলম্বন করিয়া তাহার সন্দেহ দূর করিয়া দিতেন। শিক্ষাটাকে একটা বাহিরের চাপ, আপদ বালাই বলিয়া ছাত্রের কোন দিনই মনে হইত না। বরং তাঁহার নিজের মনের সমস্ত স্বাভাবিক সংশয় গুরু দূর করিয়া দিতেছেন বলিয়া গুরুর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধা ও ভক্তি বর্দ্ধিত হইত এবং আনন্দ ও তৃপ্তির ভিতর দিয়া শিষ্যের শিক্ষা অগ্রসর হইত। গীতায় আমরা দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ নিজে কোন শিক্ষা দিতে অগ্রসর হন নাই, যদিও অর্জ্জুনকে গভীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি অর্জ্জুনকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিলেন, যেন অর্জ্জুনের ভিতরে আপনা হইতেই ঐ বিষয়ে প্রশ্ন জাগিয়া উঠে। এই সব প্রশ্ন যেমন উঠিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ তেমনিই তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। এবং এই জটিল আধ্যাত্মিক বিষয়সকল তিনি এমন মনোরম ভাবে বুঝাইয়াছেন যে, অর্জ্জুনের শুনিবার আগ্রহ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাই অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥

বাস্তবিক গীতার অমৃতময় শিক্ষা শ্রবণ করিয়া কাহার আশা মিটে? কাহার না অর্জ্জুনের ন্যায় পুনঃ পুনঃ শুনিতে ইচ্ছা হয়?

অর্জ্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ। প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের বিষাদ বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহাই গীতা-শিক্ষার উপক্রমণিকা (Introduction)। এই বিষাদের ঠিক মর্ম্ম বুঝিলে তবেই গীতার প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করিতে পারা যায়। অনেকেই বলিয়া থাকেন গীতা সংসারে থাকিয়া সংসারীর, গৃহস্থের যাবতীয় কর্ত্তব্য-পালন শিক্ষা দিয়াছে। এইরূপ কর্ত্তব্য-পালনের ভিতর দিয়াই পরমা গতি লাভ করা যায়। কিন্তু অর্জ্জুন আজীবন এইরূপ কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছিলেন, এই কর্ত্তব্যপালন ধর্ম্ম তিনি বেশই বুঝিতেন, যতদিন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন, ততদিন তাহার কোন বিভ্রাটই হয় নাই। কিন্তু মানুষ এইরূপ সাধারণ ভাবে যে জীবন যাপন করে, তাহা প্রকৃত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সংসারের বাস্তবিক রূপটা মানুষ ভাল করিয়া দেখিতে পায় না, গতানুগতিক ভাবে কোনরকমে জীবনটি কাটাইয়া দেয়। কলু যেমন তাহার বলদের চোখে ঠুলি বাঁধিয়া অনবরত ঘানির চারিপাশে তাহাকে ঘুরায়, মানুষও তেমনি অজ্ঞানের ঠুলি চোখে দিয়া সংসারের গতানুগতিক জীবন যাপন করে। কিন্তু যখন কোনরকমে এই ঠুলি খুসিয়া যায়, যখন সংসারের প্রকৃত রূপটা কতকটা তাহার চোখে উদ্ভাসিত হয়, তখন মানুষ বুঝে যে, তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নীতির মূল্য কত সামান্য, সে সব কত সীমাবিদ্ধ, নিজেরাই দ্বন্দ্ব-বিরোধে পরিপূর্ণ,

তাহাদের দ্বারা জীবনের গভীর সমস্যাসমূহের কোন সমাধানই হয় না। তখন তাহাদের অন্তরে সংশয়, নৈরাশ্য, অবসাদ উপস্থিত হয়, তখন এই দুঃখ-দ্বন্দ্বময় সংসারের জীবন ছাড়িয়া পলাইতে ইচ্ছা হয়। অর্জ্জুনের বিষাদে মানবজাতির এই চিরন্তন বিষাদই সূচিত হইয়াছে। যে গভীর ভাবে দেখিবে সেই বুঝিবে যে, মানুষ সাধারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য অনুসরণ করিয়া যে জীবন যাপন করে তাহা অতি ক্ষুদ্র, দ্বন্দ্বময়, অজ্ঞানময়; তাহাতে সুখ অপেক্ষা দুঃখই বেশী, শান্তি অপেক্ষা অশান্তিই বেশী। মানুষের অন্তরাত্মা যে গভীর আনন্দ উপভোগ করিতে চায় সাংসারিক জীবন শুধু তাহার আশা দেয় কিন্তু সে আশার তৃপ্তি করিতে পারে না। যাহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক তাহারা জ্ঞানের চর্চ্চার দ্বারাই সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে সংসারের এই অপূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু অর্জ্জুনের ন্যায় রাজসিক কর্ম্মীরা ধাক্কা খাইয়াই এই সত্য উপলব্ধি করেন; সংসারের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া যখন তাহারা কর্ম্মের নীতি স্থির করিতে পারেন না, ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ হন, তখন তাহাদের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহাদের রাজসিকতা প্রতিক্রিয়ার ফলে তামসিকতাই আনয়ন করে।

কিন্তু সংসারের এই যে দুঃখ-দ্বন্দ্বময় রূপ, ইহাই মানব-জীবনের সব নহে। মানুষ জ্ঞান লাভ করিয়া, আত্মাকে জানিয়া, আত্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবানের সহিত

সাক্ষাৎ যোগে যে অধ্যাত্ম জীবন লাভ করে, তাহাতেই আত্মার প্রকৃত তৃপ্তি হয়, তাহাই দিব্য জ্ঞান, দিব্য শক্তি, দিব্য আনন্দের জীবন। সে অবস্থায় সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাজ করা চলে; কিন্তু সে কর্ম্মের ভাব ও ধারা হয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কয়লা ও হীরক মূলতঃ একই জিনিস কিন্তু একটি আর একটির বিশুদ্ধ রূপান্তরিত মূর্ত্তি। তেমনিই সাধারণ সাংসারিক জীবন যোগের দ্বারা দিব্য-জীবনে পরিণত হয়। সেই দিব্যজীবন কিভাবে লাভ করা যায় তাহাই গীতার প্রকৃত শিক্ষা। অতএব গীতা কেবল সাংসারিক কর্ত্তব্য পালন শিক্ষা দিয়াছে, এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। তবে এরূপ কর্ত্তব্য পালনের দ্বারা মানুষ গীতার সেই অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক শিক্ষা বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার যোগ্যতা লাভ করে। অর্জ্জুন চিরকাল ভগবানের দিকে মন রাখিয়া সাংসারিক কর্ত্তব্য-ধর্ম্মের পালন করিয়াই গীতা শিক্ষালাভের উপযুক্ত পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অর্জ্জুন সংসারের দুঃখ দেখিয়া সংসার হইতে সরিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই দুঃখ অতিক্রম করিবার আর এক উপায় দেখাইলেন, বাহিরের কোনরূপ ত্যাগ প্রয়োজন নাই, ভিতরে বাসনা ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া আত্মার সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহসংসারেই দুঃখকে জয় করা যায়,

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাম্ সাম্যে স্থিতং মনঃ। ৫।১৯

এই ভিতরের ত্যাগের প্রকৃত স্বরূপ কি, কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হয়, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির দ্বারা ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া মানুষ কেমন করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, দুঃখ অতিক্রম করিয়া ইহসংসারেই আনন্দময় দিব্যজীবন লাভ করে, অমৃত-মশ্নুতে, তাহাই গীতার প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষার উপক্রমণিকা-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাধারণ সাংসারিক জীবনের অসারতা ও অসম্পূর্ণতা ভাল করিয়া উপলব্ধি করাইয়া দিলেন, ইহাই অর্জ্জুনের বিষাদের প্রকৃত রহস্য।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ

শ্রীঅরবিন্দের গ্রন্থাবলী

শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত—

শ্রীঅরবিন্দের গীতা (Essays on the Gita) মূল্য ১ম খণ্ড—১।০, ২য় খণ্ড—২॥০, ৩য় খণ্ড—১।০, ৪র্থ খণ্ড —১।০

"অনুবাদ খুবই ভাল হইতেছে। এই অনুবাদের সাহায্যে সাধারণে সহজেই গীতার অর্থ বুঝিতে পারিবেন।"—**শ্রীঅরবিন্দ**

"আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বলিতে পারি যে, এই বাংলা বইখানি পাঠ করিয়া আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।" **রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন।**

ভারত কি সভ্য (Is India civilised ?)—মূল্য ৸০ বার আনা। ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কি, তাহার প্রকৃত শক্তি কোথায় ? কি করিলে "ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে"।

ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা (A Defence of Indian Culture) অপূর্ব্ব রাজনীতিক প্রতিভা ও বীরত্ব থাকা সত্ত্বেও ভারত কেন পরাধীন হইল, ভারতের রাষ্ট্র-নীতিক ঐক্যসাধনের মূল সূত্র কি, শ্রীঅরবিন্দ দিব্য দৃষ্টি লইয়া তাহার গভীর সন্ধান দিয়াছেন।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক অনূদিত—

মা (The Mother) মূল্য ৸৹ বার আনা

শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও সাধনার নিগূঢ় রহস্য অপূর্ব্ব তেজস্বিনী ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে।

ভারতের নবজন্ম (The Renaissance in India) মূল্য ১।৹

ভারতের নব জাগরণের স্বরূপ ও লক্ষ্য নির্ণয়।

"নলিনীবাবুর লেখায় মৌলিক ও অনুবাদ—ভেদ করা যায় না। বইখানি বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী সম্পদ-স্বরূপ"—**প্রবর্ত্তক**।

কর্ম্মযোগী (The Ideal of the Karmoyogin) মূল্য ২৲ টাকা।

"এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুল্‌বে।"—শ্রীঅরবিন্দ

Books by Anilbaran Ray

Mother India. **As. 12**

"A great nation which has had that vision can never again be placed under the feet of the conqueror."

—**Sri Aurobindo.**

India's Mission in the World. **As. 12**

"I have read it and find that it expresses vital truths in simple language."—**Sir S. Radhakrishnan D. Litt. Vice-Chancellor. Andhra University.**

"Excellent small book—presents a true India with her imperfections and possibilities before our eyes—will be welcomed by all both Indians and peoples outside especially in view of the ferment and turmoil that beset most of the present day values."—**Forward.**

"I welcome your book and hope that it will be widely circulated. We must have faith in India and all she stands for and not pay mere lip service to Bharata-mata while trying all the time to refashion her into a pale copy of America, Turkey, England or Russia."—**Krishna Prem** (Prof. R. Nixon, late of the Lucknow University)

The Illusion of the Charka. **Rs. 1/4**

Discussing in full the injury done to the country by the Khaddar movement of Mahatma Gandhi, the author gives a comprehensive analysis of the deep and chronic proverty of the Indian masses as well as its truly effective remedy.

"The programme of the charka, is so utterly childish that it makes one despair to see the whole country deluded by it."—**Rabindranath Tagore.**

"Mr. Ray's arguments are well-nigh irrefutable. The sooner our people break the illusion of the charka the better."—**Prabuddha Bharata.** Re 1/4

Caste and its Future. **1 A.**